দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

আমাদের সংবিধান
ভারতের প্রাচীন মহান
ঐতিহ্য বহন করে চলেছে
— পৃঃ ৩৫

৭৫ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা।। ৫ ডিসেম্বর, ২০২২।। ১৮ অগ্রহায়ণ - ১৪২৯।। যুগাব্দ - ৫১২৪।। website : www.eswastika.com

ভালোবাসার ৩৫ টুকরো

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

৫ ডিসেম্বর - ২০২২, যুগাব্দ - ৫১২৪,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফ ঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

আত্মরক্ষার স্বার্থে ‘যখন যেমন তখন তেমন মমতা’
◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

দিদিরও গর্ব মোদী ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

সংখ্যাতত্ত্বে হেরফের করে উপনিবেশবাদ দিব্যি চলছে
◻ সঞ্জীব সান্যাল ও আকাঙ্ক্ষা অরোরা ◻ ৮

কমিউনিজমের সংকট ঘনীভূত ◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

জেলকে রিসর্ট বানিয়ে ফেলেছেন মমতা
◻ অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ১১

উত্তর-পূর্বে টাকার লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরণ
◻ নিখিল চিত্রকর ◻ ১৩

পুলিশের কামড় বাঙ্গলার সংস্কৃতিকে কলঙ্কিত করল
◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৬

শ্রদ্ধাকে খুন করা হয়েছে জানত আফতাবের পরিবার
◻ শ্রীতমা পাল ◻ ১৭

ইন্টার-কমিউনিটি অপরাধ বিচারে পৃথক ফৌজদারি আইন আবশ্যক ◻ দেবযানী ভট্টাচার্য্য ◻ ২৩

একটি ধর্মনিরপেক্ষ হত্যা ও কিছু প্রশ্ন ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ২৭

দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ◻ দীপক খাঁ ◻ ৩১

হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিতবিহার
◻ বিমল কৃষ্ণ দাস ◻ ৩৩

আমাদের সংবিধান ভারতের প্রাচীন মহান ঐতিহ্য বহন করে চলেছে ◻ নরেন্দ্র মোদী ◻ ৩৫

কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রস্তাব দুবার প্রত্যাখ্যান করেছেন নেহরু
◻ দিগন্ত চক্রবর্তী ◻ ৩৭

সর্বগুণান্বিত বিস্ময় উদ্ভিদ গাঁজা
◻ অধ্যাপক নির্মল মাইতি ◻ ৪৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ রঙ্গম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪৭ ◻ চিত্রকথা : ৫০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১২ ডিসেম্বর
২০২২

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

রাজ্য কর্মীদের বকেয়া ডিএ

পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকারি কর্মীদের প্রাপ্য ডি-এ অনেকদিন ধরেই বকেয়া। এ নিয়ে দীর্ঘ আন্দোলন, মামলা-মোকদ্দমা চলেছে, কিন্তু সুরাহা হয়নি। রাজ্য সরকার আদালতে হলফনামায় জানিয়েছে, কর্মীদের ডিএ মেটাতে গেলে রাজ্য চালানো যাবে না। আদালত কিন্তু অবিলম্বে ডিএ মেটানোর নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্য সরকার হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের আশ্রয় নিয়েছে।

প্রশ্ন উঠছে, কর্মীদের প্রাপ্য ডিএ নিয়ে রাজ্য সরকার কেন গড়িমসি করছে? দেশের অন্যান্য রাজ্যের কর্মীরা যেখানে বর্ধিত হারে ডিএ পাচ্ছেন সেখানে আমাদের রাজ্যের এই অবস্থা কেন। খেলা-মেলা অনুদান খয়রাতিতে দরাজ হাতে টাকা বিলোনো কি জরুরি ছিল?।

এসব নিয়েই আগামী সংখ্যায় থাকবে বিস্তৃত বিশ্লেষণ। লিখবেন— দীপ্তাস্য যশ, বিশ্বপ্রিয় দাস প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। আগামী ১ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড নম্বর-সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শ্রদ্ধাহীন প্রেম

লাভ জিহাদ শব্দ দুইটি আবার একবার সকলের চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছে ইহার বাস্তবতা। বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে সমাজ সচেতন কতিপয় ব্যক্তি বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, মরু সংস্কৃতির জিহাদ এখনো চলিতেছে। তবে ভিন্ন প্রকারে। অমুসলমান বিশেষ করিয়া হিন্দু কন্যাদিগকে প্রেমজালে ফাঁসাইয়া বিবাহ এবং তৎপর ধর্মান্তরিত করিয়া হিন্দু সমাজের বুকে আঘাত হানা চলিতেছে। বৃহত্তর ইসলামিক চক্রান্তের ইহা একটি অঙ্গ। শুধুমাত্র গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র পরিবারের কন্যাই নহে, বিধর্মীয় যুবকদের প্রেমজালে শিক্ষিতা ও ধনী পরিবারের কন্যারাও পড়িয়া যাইতেছেন। বিবাহের পর ধর্মান্তরিত হইতে অস্বীকৃত হইলে তাহাদের জীবনে নামিয়া আসে নির্মম অত্যাচার অথবা নৃশংস হত্যা। ইহারই সাম্প্রতিকতম জ্বলন্ত উদাহরণ হইল শ্রদ্ধা ওয়াকর হত্যাকাণ্ড। পঁচিশ বৎসরের শ্রদ্ধা ওয়াকর প্রেমে পড়িয়াছিল বিধর্মী যুবক আফতাব পুনাওয়ালার। পরিণতিতে পঁয়ত্রিশ টুকরা হইয়া, বেশ কয়েকদিন নূতন রেফ্রিজারেটরে স্থান পাইয়া, অবশেষে দিল্লির জঙ্গলে শিয়াল-কুকুরের খাদ্য হইয়া শ্রদ্ধাকে প্রেমের মূল্য চোকাইতে হইয়াছে। শ্রদ্ধার পরিণতি কি মনে করিয়া দিতেছে না বিগত আশির দশকে বাঙ্গালি কন্যা সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যয়ের কথা? এই কলকাতাতেই বিধর্মী আফগান যুবক জানবাজের প্রেমে পড়িয়াছিলেন সাতাশ বৎসরের সুস্মিতা। পিতা-মাতার স্নেহের দুলালি, তাঁহাদের সমস্ত রকম সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করিয়া জানবাজকে বিবাহ করিয়া আফগানিস্তানে চলিয়া গিয়াছিলেন। অনতিকাল পরেই তিনি হাড়ে হাড়ে টের পাইয়াছিলেন বিধর্মী জাতিটা কত ভয়ংকর। টের পাইয়াছিলেন তাঁহার পরিবারের সদস্যরাও। শারীরিক ও মানসিক অকথ্য অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া দুই বারের প্রচেষ্টায় কলকাতায় পলাইয়া আসিতে সক্ষম হইয়াছিলেন সুস্মিতা। কলকাতায় ফিরিয়া তিনি তাঁহার জীবনের সেই করুণ কাহিনি লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'কাবুলিওয়ালার বাঙালি বউ' নামের পুস্তকটি শত শত সংখ্যায় বিক্রয় হইয়াছিল। তিনি সেই পুস্তকে ওই বিধর্মীদের হাড় হিম করা সমাজ ব্যবস্থার কথা লিখিয়াছেন। বন্দুকের নল মুখে ঠেকাইয়া তাঁহাকে ইসলাম কবুল করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল। তাঁহার নাম পরিবর্তন করিয়া আরবি নাম রাখা হইয়াছিল। লিখিয়াছেন, যে প্রতিবাদ করিবে তাহাকে প্রাণ দিতে হইবে। শ্রদ্ধা ওয়াকর হত্যাকাণ্ড কি মিলিয়া যাইতেছে না সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত? একশত ভাগ মিলিয়া যাইতেছে। একশত ভাগ ইহা লাভ জিহাদ। শ্রদ্ধার বাবাও বলিয়াছেন তাঁহার কন্যাকে লাভ জিহাদে ফাঁসানো হইয়াছে এবং নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে। মরু সংস্কৃতির এই আগ্রাসন লাভ জিহাদকে বামমার্গী ও সেকুলার রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীগণ বরাবর অলীক ও নির্বাচনকালীন অপপ্রচার বলিয়া পরিহাস করিয়াছেন। তাহারা লাভ জিহাদকে শুধু সমর্থনই করেন নাই, ইন্ধনও জোগাইয়াছেন। তাহাদের কথায়, প্রতি বৎসর হাজার হাজার যুবক-যুবতী পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জাতি ও ধর্মের তোয়াক্কা না করিয়া প্রেম করিয়া বিবাহ করিতেছে ইহা তো বড়োই মঙ্গলের কথা। তাহাদের মতে, ইহা শুধু ভালোবাসার জন্যই ভালোবাসা। জিহাদ ফিহাদ কিছু নহে। প্রেমের টানে ধর্মের বেষ্টনী ভাঙিয়া ফেলা সম্ভব হইলে ধর্মের গোঁড়ামি দূর করা যাইবে। ইহাতে পুরুষতান্ত্রিক আগ্রাসন হইতে মুক্ত হইয়া মানবিক স্বচ্ছতা আনা যাইবে। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় হইল, একটি যুবতীকে নৃশংসভাবে হত্যা করিবার পর কাটিয়া পঁয়ত্রিশ টুকরা করা হইল অথচ দেশের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও নারীবাদীদের কোনোরূপ উচ্চবাচ্য করিতে দেখা গেল না। আফতাব একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের বলিয়াই কি এই নীরবতা?

সুখের বিষয় হইল, বিলম্বে হইলেও সমাজ এই বিষয়ে সচেতন হইতেছে। লাভ জিহাদের সমর্থনে একটি বাংলা ধারাবহিক দর্শকরা বয়কট করিয়াছেন। কয়েকটি রাজ্য সরকার ইহার প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন করিয়াছে। ভারতের খ্রিস্টান সমাজও লাভ জিহাদের প্রতিবাদ করিয়াছে। তাহাদের ক্যাথলিক বিশপস কাউন্সিল জানাইয়াছে, ২০০৯ সালে শুধুমাত্র কেরালাতেই তাহাদের চার হাজার যুবতীকে প্রেমজালে ফাঁসাইয়া ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে। হিন্দু জনজাগৃতি সমিতির মতে, শুধুমাত্র কর্ণাটক রাজ্যেই কয়েক হাজার হিন্দু কন্যাকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে। দেশের অধিকাংশ রাজ্য সরকার সচেতন হইলেও পশ্চিমবঙ্গ এই বিষয়ে নীরব রহিয়াছে। সুস্মিতা বন্দ্যোপাধয়ের জীবন লইয়া বলিউড চলচ্চিত্র নির্মাণ করিলে টলিউডও করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছিল। কিন্তু কাহাদের রক্তচক্ষুর ভয়ে পিছপা হইয়াছে। দলদাস বুদ্ধিজীবীরাও মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। বিপদ একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ না করিলে বাঙ্গালি বুদ্ধিজীবীরা জাগ্রত হন না। এইহেন ভয়ংকর বিপদে বালিতে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া না থাকিয়া মরু সংস্কৃতির এই জিহাদি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সবাইকে রুখিয়া দাঁড়াইতেই হইবে।

সুভাষিতম্

চতুর্ধা পুরুষা লোকে সঙ্ঘকার্যোপকারকঃ।

মর্মজ্ঞঃ যুক্তকর্মজ্ঞঃ সদ্‌গুণাজ্ঞঃ সুযোজিকঃ।।

সমাজে সঙ্ঘকাজের (সংগঠনের) উপযোগী চার প্রকার ব্যক্তি হয়ে থাকেন— যিনি নিগূঢ় অর্থ নির্ণয়ে সমর্থ, করণীয় কাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞ, সদ্‌গুণ সমন্বিত এবং সুনিয়োজক।

আত্মরক্ষার স্বার্থে 'যখন যেমন তখন তেমন মমতা'

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

আত্মরক্ষার স্বার্থে রাজার ধন আর সম্পত্তি বলিদান দিতে তৈরি থাকা উচিত, বলেছিলেন আচার্য চাণক্য। মমতাকে ঘিরে আজ সেই প্রশ্ন উঠছে আগামীদিনে দল বা পরিবারকে বাঁচাতে মমতা নিজেকে বলিদান দিতে কতটা রাজি থাকবেন। রাজ্য বিজেপির তথাকথিত 'ডিসেম্বর সনদ'-এ দাবি করা হচ্ছে যে এ মাসেই মমতার রাজ্যপদ ধ্বংস হতে চলেছে। বিজেপি নেতারা প্রকাশ্যে বলছেন মমতার দিন শেষ। কেন আর কীভাবে তা খোলসা করছেন না। দলের জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষকে বাদ দিলে এ ব্যাপারে দলের সব কেন্দ্রীয় নেতাই নিশ্চুপ। 'স্পিক টি নট'। কারণটা রহস্যময়। রাজ্যের বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী আগেভাবেই বলে রেখেছেন মমতা সরকার আত্মসমর্পণ করেছে।

সবাই জানেন মমতা চতুর রাজনীতিক। যখন যেমন, তখন তেমন। অনেকে বলেন তিনি 'রাজনৈতিক হাওয়া মোরগ'। যেমন ছিলেন বিহারের লোক জনশক্তি পার্টির নেতা রামবিলাস পাসোয়ান। রামবিলাসের মতো মমতা লোকসভা বা বিধানসভায় কোনোদিন বিরোধী আসনে বসেননি। সদা শাসকের সঙ্গে থেকেছেন। শাসকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তবে হাত ছেড়ে দেননি। শাসক কে হবেন বা হতে পারেন তা বুঝতে রামবিলাস কোন দলের সঙ্গে রয়েছেন সেটা জানতে হয়। পশ্চিমবঙ্গেও ঠিক তাই। কেন্দ্রের শাসক কী ভাবছেন বা করবেন তা বুঝতে মমতার কার্যকলাপ নজর করলেই চলে।

তৃণমূলের মতো একটি ছোটো দল চালান মমতা। দলীয় কর্মীদের তাকে বড়ো করে তৈরি করার স্বপ্ন দেখান। ওই পর্যন্ত। কার্যকলাপে মমতা বুঝিয়ে দেন স্বপ্ন দেখায় দোষ নেই। বাস্তবে তা না হতে পারে। মমতা জানেন আগামীদিনে ইডি বা সিবিআইয়ের ফাঁসে তাঁর দলের অনেক নেতা-নেত্রী আটকে পড়বেন। হয়তো মমতা নিজেও তার ব্যতিক্রম হবেন না। তাই আগেভাবেই সভায় গাওনা গেয়ে রেখেছেন, 'আমাকে ধরতে এলে আপনারা রাস্তায় নামবেন তো'? এ ব্যাপারে তার পরিবারের সদস্যরা যে বাদ যাবেন না তার ইঙ্গিতও দিয়ে রেখেছেন মমতা। তবে তাতে মমতার কি অগ্নিশুদ্ধি হবে? এখনই তা বলা সম্ভব নয়। এমন হতেও পারে নিজেকে তাদের কাছে সমর্পণ করে দেবেন মমতা। করিয়ে নেবেন এক ধরনের অগ্নিশুদ্ধি। কৌশলে ভেঙে পড়া ভাবমূর্তি গড়ার আর কি সুযোগ থাকতে পারে।

মমতার অগ্নিপরীক্ষা ২০২৩-এর পঞ্চায়েত ভোট। এই মুহূর্তে রাজ্যের প্রায় ৭৪ গ্রাম পঞ্চায়েত আসনের আনুমানিক ৩০ হাজার আসন সরাসরি তৃণমূলের দখলে। ২০১৮-র পঞ্চায়েত ভোটে প্রায় ৩৫ শতাংশ মানুষকে মমতার দল জোর করে ভোট দিতে দেয়নি বলে অভিযোগ উঠেছিল। সিপিএম তার মেয়াদকালে ২০০৩-এর পঞ্চায়েত ভোটে ১১ শতাংশ মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি। মমতা তা ভেঙে দেন। তবে প্রমাণের অভাবে মমতা আর তার সরকারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছিল আদালত তা খারিজ করে দেয়। ২০২৩ সালের পর থেকে রাজ্যের প্রায় ৩৩০০ গ্রাম সভায় তাদের প্রতিনিধি পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল তৃণমূল। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর এতটাই উন্নাসিক হয়ে উঠেছিল মমতা আর তার দল। পঞ্চায়েত বিষয়ে যে কোনো আলোচনার কেন্দ্র গ্রামসভা। তাকেই গুরুত্বহীন করে দিয়েছিল মমতার সরকার। সম্প্রতি পঞ্চায়েত দপ্তর জানিয়েছে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামসভার অধিবেশন ডাকতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূলকে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে হবে। বলাই চলে রাজ্যের রাজনৈতিক হাল চাল দেখে অনেকটা বেকায়দায় পড়েই মমতার সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।

> **মমতা জানেন ইডি বা সিবিআইয়ের ফাঁসে তাঁর দলের অনেক নেতা-নেত্রী আটকে পড়বেন। হয়তো মমতা নিজেও তার ব্যতিক্রম হবেন না। তাই আগেভাবেই গাওনা গেয়ে রেখেছেন, 'আমাকে ধরতে এলে আপনারা রাস্তায় নামবেন তো'?**

রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ধারে পাশে কোনো বিরোধী নেতা বড়ো একটা যেতেন না বা যেতে ভয় পেতেন। ১৯৭৭ থেকে ২০০০ সালের ভিতর অভিজ্ঞতা আর বয়সের ভারে জ্যোতিবাবুর সমকক্ষীয় বিরোধী নেতা প্রায় ছিল না বললেই চলে। ব্যতিক্রম কিছুদিনের জন্য 'মানুবাবু' অর্থাৎ সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়। বিরোধী আসনে বসলেও মানুবাবু জ্যোতিবাবুর বন্ধু স্থানীয়। তাই তাকে বিরোধী না বলে বিরোধী বন্ধু বলাই ভালো। ব্রিগেডের মিটিঙে জ্যোতিবাবু বলতেন, 'ওর (মানুবাবুর) নাম মুখে আনতে ঘেন্না করে।' সিদ্ধার্থ মশকরা করে দাবি করতেন, 'জ্যোতির ছেলের (শুভব্রত বা চন্দন বসু) লন্ডনে থাকার ব্যবস্থা আমি করে দিয়েছিলাম।' রাজ্যের বিরোধী নেতাকে 'ভাই' বলে ডাকতে শুরু করেছেন মমতা। কয়েকদিন আগেই তিনি ছিলেন 'গদ্দার'। মমতার এখন সসেমিরা অবস্থা। মনে হয় এসব মন ভুলানো 'গদ্দার ভাই' তৈরি করে মানুষের বিচারের হাত থেকে খুব সহজেই রেহাই পাবেন। □

দিদিরও গর্ব মোদী

মোদীবিরোধীষু দিদি,

এই চিঠি লেখার আগে আপনার জানা কিছু কথার অবতারণা করতে চাই।

সম্প্রতি বালি থেকে ফেরার পথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে একটি বিশেষ প্রতীক— জি-২০ প্রেসিডেন্টের হাতুড়ি ভারতে এসেছে। বিশ্বস্তরে অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করে যে আন্তর্জাতিক সর্বোচ্চ সংস্থা, তার প্রধান নেতৃত্বের প্রতি সম্মানজ্ঞাপক প্রতীক এই হাতুড়ি। সদ্যসমাপ্ত জি-২০ সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে জোটের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করেছে ভারত। এ এক বড়ো সম্মান দিদি। দেশের এই সম্মানে আমি আপনার অনুগত হয়েও মোদীর নেতৃত্বের প্রশংসা না করে পারছি না। আশা করি, আপনিও গর্ব অনুভব করবেন।

এই ডিসেম্বরের ১ তারিখ থেকে দায়িত্ব শুরু হলো ভারতের। ২০২৩ সালের শীর্ষ সম্মেলনটির আয়োজন হবে দিল্লিতে। পরিবেশ বিষয়ক কার্যক্রমের মধ্যে জি-২০'র প্রধানের দায়িত্বভার বহন একটা বিশেষ সম্মানের বিষয়। সম্মানের সঙ্গে দায়িত্বেরও বিষয় বটে। সাম্প্রতিককালে ভারত বারংবার 'গ্লোবাল সাউথ'-এর কথা বলে উন্নয়নশীল দেশগুলির কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশ্বজোড়া ভূরাজনৈতিক টানাপড়েন, আর্থিক মন্দা, ক্রমবর্ধমান খাদ্য ও জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি এবং অতিমারির দীর্ঘমেয়াদি কুপ্রভাবের মতো বহুবিধ চ্যালেঞ্জের সামনে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়াকে সুষ্ঠু রূপদান জি-২০'র মতো গোষ্ঠীর সামনে এখন বড়ো চ্যালেঞ্জ। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যদিকে পরিবেশবান্ধব নীতি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ অনুসন্ধানের মতো দুরূহ চ্যালেঞ্জও রয়েছে। গোটা দেশের সঙ্গে আমিও মনে করছি মোদীজীর নেতৃত্বে সেই সাফল্য ভারত পাবে। জগৎসভায় ভারতের নাম উজ্জ্বল হবে।

এ বারের সম্মেলনের বিবৃতিতে বিশ্ব-অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার প্রয়োজনীয়তা, সুস্থায়ী উন্নয়ন, আরও কর্মসংস্থান তৈরির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আগামী বছর দিল্লি সম্মেলনের প্রস্তুতি পর্বে দু'শোটিরও বেশি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হবে। ভারতের কাছে এটা বড়ো সুযোগ। বিশ্ব দরবারে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্য তুলে ধরার সুযোগ, গ্লোবাল সাউথের পক্ষ থেকে শান্তির দূত হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার অবকাশ। দেশের অভ্যন্তরীণ বৈচিত্র্য ও শান্তি যথেষ্ট মাত্রায় রক্ষিত হচ্ছে কি না, প্রধানমন্ত্রীকে তাও দেখতে হবে বইকী! বালিতে প্রেসিডেন্ট পদ হস্তান্তরের সময়ে ভারতকে গণতন্ত্রের জননী হিসেবে উল্লেখ করেছেন মোদী। ভারতের জি-২০'র সভাপতিত্বের পরিসরটিতে দেশের মধ্যে সেই গণতন্ত্রের দাবি সুরক্ষিত ও সম্মানিত করাও এখন ভারত সরকারের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ নিশ্চয়ই। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি সকলকে নিয়েই সাফল্যের পথে এগোতে চান।

দিদি, আমি সম্প্রতি গুজরাট ঘুরে এলাম। বেশ কয়েকটা শহরে গিয়েছি। তবে বলেছি রাজধানী আমেদাবাদের কথা, কথা হলো গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে। তাঁরা বলছেন, এটা তো মানতেই হবে গুজরাটিদের অস্মিতা বাড়িয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। রাজ্যে এমন মুখ্যমন্ত্রী আগে হয়নি, দেশে এমন প্রধানমন্ত্রীও আগে হয়নি। শুধু দেশে নয়, বিদেশেও তিনি সবার মন জয় করেছেন। গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে শেঠ দামোদর দাস স্কুল অব কমার্সের রাস্তায় চা ছাড়াও নানা খাবারের দোকান। সেখানেই আড্ডা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের। রাজনীতির আলোচনা বিশেষ নেই। তবে মোদীর প্রসঙ্গ তুলতে কথা বললেন অনেকে। তাঁদেরই একজন চেতন বরাইয়া বললেন, 'কাকে ভোট দেব সেটা অন্য কথা। কিন্তু মোদী আমাদের কাছে অন্য কিছু। এখন আমরা কোথাও গেলে সবাই বলে মোদীর রাজ্যের লোক। বিদেশে গেলে বলে, মোদীর দেশের লোক।' সবাই এমনটাও বলে যে, 'হীরাবেন এক হীরা দিয়েছে গুজরাটকে, দেশকে। সেই হীরাই গুজরাটের গর্ব, দেশের গর্ব।'

তাঁরা 'মর্নিং কনসাল্ট পলিটিক্যাল ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ' নামে এক সংস্থার সমীক্ষা দেখালেন। সেখানে বিশ্বের মধ্যে সেরা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে মোদী ভোট পেয়েছেন ৭৭ শতাংশ। দ্বিতীয় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী এবং তৃতীয় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। সেই রিপোর্ট দেখিয়ে ওঁরা বলছেন, 'ভারতের গর্ব তো বটেই, এটা গুজরাটেরও অহংকার। এই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গোটা বিশ্ববন্দিত।'

খুব মন খারাপ লাগছিল দিদি। আমি একটু গর্ব প্রকাশ করতে পারিনি। আমার কিছুই নেই। যা আছে, সেগুলো আসলে ছিল। এখন স্মৃতি আর ঐতিহ্যই সম্পদ। বর্তমান মানে বাঙ্গালির কাছে শুধুই হীনমন্যতা। □

অতিথি কলম

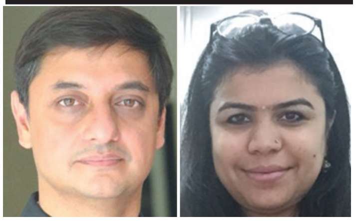

সঞ্জীব সান্যাল ও আকাঙ্ক্ষা অরোরা

সংখ্যাতত্ত্বের হেরফেরে চাঙ্গা উপনিবেশবাদ

বিশ্বের প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলি মনগড়া হলে তা ভারত সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সবেরই ক্ষতিসাধন করবে।

অর্থনীতির তথাকথিত পণ্ডিতদের বাজারে আনাচে কানাচে একটু অনুসন্ধান করলেই খোঁজ পাওয়া যায় যে, নানা বস্তুর বাজারের মতো তাঁদেরও তথ্য সংগ্রহ করার একটি চটজলদি বাজার সদা ক্রিয়াশীল। তাঁরা বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন পণ্ডিত। বিশ্বের দরবারে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁদের ভারত সম্পর্কে মূল্যায়ন নিয়মিত নিম্নগামী। এই অধোগমন আবার নজর করলে দেখা যাবে ১৯১৪ সাল থেকে যেন সংকল্পবদ্ধভাবে ঘটে চলেছে। বিশ্বের নানান গুরুত্বপূর্ণ সূচকে এই অবনমন সূচিত করা হচ্ছে।

ইতিপূর্বের একটি সমীক্ষায় (১৮.১০.২২) ভারত সম্পর্কে সূচকগুলির যথার্থতা নিয়ে আমাদের সন্দেহ হয়। বিশেষ করে হিউম্যান ডেভলপমেন্ট ইনডেক্স নিয়ে যা শুধুমাত্র প্রামাণ্য পরিসংখ্যানের ওপর নির্ভরশীল থাকা বাঞ্ছনীয়। এখানে অসঙ্গতি পাওয়ায় আমরা কেবলমাত্র পরিসংখ্যানভিত্তিক নয় এমন সূচকগুলির দিকেও নজর করি। এই মতামতনির্ভর সূচকগুলি যাকে ইংরেজিতে সাবজেক্টিভ বলা হয় অর্থাৎ নিতান্তই অনুমাননির্ভর, যেমন গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, নাগরিক মানসিকতা প্রভৃতি। এই ক্ষেত্রগুলিতে যেন গন্ধ শুঁকে মতামত নির্মিত হচ্ছে।

এক্ষেত্রে ভারতের তরফ থেকে এখন পর্যন্ত এই ধরনের ধারণাভিত্তিক মতামতগুলিকে অবজ্ঞা করার নীতিই পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এই ধরনের সূচক বিশ্বে ভারত সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা তৈরির ক্ষেত্রে নিশ্চিত নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, বিশ্ব ব্যাংকের তৈরি World Governance Indicator বা WGI বিশ্বের নানা দেশের প্রশাসনিক কার্যকলাপ তৈরির ক্ষেত্রে এই সমস্ত সূচকগুলি ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ এর ভিত্তিতেই গুরুত্বপূর্ণ সূচক তৈরি হয়। এগুলির ২০ শতাংশ weightage আছে যার মাধ্যমে দেশভিত্তিক চূড়ান্ত স্থান নির্ধারিত হয়। আমরা চূড়ান্ত সূচক নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনটি সহযোগী সূচকের প্রসঙ্গ উল্লেখ করব।

নিউইয়র্কে অবস্থিত ফ্রিডম হাউস বিশ্বে নাগরিক স্বাধীনতা (ফ্রিডম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইনডেক্স, এফডব্লুউআই) কতটা অনুভূত হচ্ছে ১৯৭৩ সাল থেকে এক বিশেষ থিংক ট্যাঙ্ক বা বৌদ্ধিক পাণ্ডাদের মতামতের ভিত্তিতে তা প্রকাশ করে থাকে।

(১) দৈনন্দিন নাগরিক স্বাধীনতায় (civil liberties) ভারতের স্থান ২০১৮ সাল অবধি নিস্তেজভাবে টানা ৪২তম স্থানে ছিল। হঠাৎ ২০২২ সালে এসে তা ৩৩ স্থানে নেমে গেল।

(২) রাজনৈতিক অধিকার ভোগ ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা ৩৫ থেকে ৩৩-এ নেমে এল।

(৩) এই ভাবে ভারতের মোট মূল্যায়ন সংখ্যা ৬৬-তে নেমে এসে বর্তমানে আমরা আংশিক মুক্ত পরিবেশের (partially free) ক্যাটিগরিতে পৌঁছেছি। মনে রাখতে হবে, কুখ্যাত জরুরি অবস্থার সময় আমাদের সম্পর্কে এই মূল্যায়ন করা হয়েছিল। আশ্চর্যজনকভাবে ছোট্টো একটি দেশ যারা এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের মান্যতা পায়নি সেই উত্তর সাইপ্রাস (যার নাম কম লোক জানে) তারা এই সূচকে আমাদের ওপরে ৭৭ স্থানে আছে।

সাইপ্রাসে গ্রিকদের ব্যাপক সাম্প্রদায়িক বিতাড়ন কয়েক বছর আগেই ঘটেছে। উল্লেখিত স্বাধীনতা নির্ধারণ কর্তাদের সেগুলি নজরে পড়েনি। কিন্তু তাঁরা জম্মু-কাশ্মীরকে এখনও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন একটি নাগরিক স্বাধীনতাহীন অঞ্চল বলে তকমা দিয়ে আসছে। অন্যদিকে, লন্ডনে অবস্থিত ইকনোমিক ইনটেলিজেন্স ইউনিট একটি ডেমোক্রেসি ইনডেক্স (ইআইইউডিআই) প্রকাশ করে। ২০১৪ সাল থেকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সূচক ৬.২৫ থেকে ৫ এসে নেমেছে। নাগরিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ৯.৪১ থেকে ৬.১৮-তে নেমেছে। এর ফলে উন্নত সূচক হিসেবে ২০১৪ সালে ২৭ স্থান থেকে ২০২০ সালে ভারত খারাপ পরিস্থিতি সূচক ৫৩ স্থানে প্রায় দ্বিগুণভাবে নেমে এসেছে। ২০২১ সালে সামান্য উঠে ৪৬ স্থানে গেছে। তার কারণ নাকি সরকার কৃষিক্ষেত্রে সংস্কারগুলি ফিরিয়ে নিয়েছে। বিষয়টার উদ্দেশ্য বুঝুন। পেছন থেকে দেশ পরিচালনা করতে চাইছে কেবলমাত্র মনগড়া সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে। একটু নজর করলেই এই সূচকের অসত্য প্রমাণিত হয়। ভারতের বর্তমান নাগরিক স্বাধীনতাসূচক টুকরো দেশ হং কং-এর ৮.৫৩ শতাংশের থেকে কম। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও হং কং এমনকী সদ্য ব্যাপক রাজনৈতিক হানাহানি বিধ্বস্ত শ্রীলঙ্কার ৬.২৫ শতাংশের থেকেও কম। এর মানে এই নয় যে শ্রীলঙ্কার হানাহানি এই সমীক্ষা প্রকাশের পরে হয়েছে। এগুলি

সমীক্ষকদের পরিস্থিতি নির্ধারণ করে নিদান দেওয়ার আশ্চর্য কৌশলী ক্ষমতা। এগুলিকেই বিশ্বকে খাওয়াতে হবে।

অন্যদিকে, Varieties of Democracy (V-dem) গণতন্ত্রের নানান বিভাগ মানদণ্ড করে মতামত প্রকাশ করে স্বদেশি চিন্তকরা। এঁরা ছ'টি বিষয়কে নিরীক্ষণ করে।

(১) উদার গণতন্ত্র, (২) নির্বাচিত গণতন্ত্র, (৩) এর মধ্যে উদারবাদী বিষয় কী কী থাকে, (৪) সর্বসাধারণের অন্তর্ভুক্তি কতটা, (৫) তাদের অংশগ্রহণের মাত্রা, (৫) গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে তারা কতটা উদগ্রীব। এই ধরনের বিশ্লেষণ কিন্তু মূলত তথ্যনির্ভর ও কিছুটা পরিস্থিতির তৃণমূল ভিত্তিক সর্বেক্ষণের মাধ্যমে হয়। যেমন কত শতাংশ মানুষ ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। এটি একেবারেই তথ্যভিত্তিক হওয়ায় এখানে ভারত প্রভূত উন্নতি করেছে। কিন্তু কিছু কিছু ছোটো সূচক যেগুলি সাবজেক্টিভ হয় সেখানে অনেক জায়গায় অবনমন ঘটেছে। যেমন জনগণের পারস্পরিক মত আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়নি, ০.৮৮৫ থেকে ০.৬০৫-এ নেমেছে। উদার গণতন্ত্রের সূচক কিছুটা নেমে ০.৫৬৭ থেকে ০.৩৫৭ হয়েছে।

হ্যাঁ, এই সাবজেক্টিভ সূচকে ভারত ৯৩ স্থানে রয়েছে। কিন্তু গণতন্ত্রের ব্যবহারিক ক্ষেত্রের মানদণ্ডগুলিতে মেদিনীপুর মাপের 'লেসোথো' দেশটির থেকেও যেখানে রাজা রাজত্ব করেন, আমাদের তাদের নীচে ৬০ স্থানে রাখা হয়েছে। আমাদের নাকি নির্বাচনী একনায়কতন্ত্র চলছে। কাউকে পছন্দ না হলে ১৪০ কোটির সামগ্রিক গণতন্ত্রের দেশও ক্ষুদ্র রাজতন্ত্রের থেকে পিছিয়ে পড়ে। উল্লেখিত 'লেসোথো' দেশটিতে ৯০ সাল থেকে গণতন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলতে চলতেই ২০১৪ সালে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে যায়। এখন সেখানে জরুরি অবস্থা চলছে। গণতান্ত্রিক মানদণ্ডে বৌদ্ধিক পাণ্ডারা কিন্তু তাদের এগিয়ে রেখেছে।

তাই ন্যায্য প্রশ্ন ওঠে এই রহস্যময় বিশেষজ্ঞ কারা? কীভাবে তাঁরা প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে এমন বড়ো মাপের সমীক্ষা রিপোর্ট দেন? আমরা অনুসন্ধান করে দেখেছি মূলত জনা ছয়েক অন্তরালে থাকা মহামহিম বৌদ্ধিক মহাগুরু আছেন তাঁরাই চূড়ান্ত নিদান দিয়ে থাকেন। বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে এই অতি উচ্চমানের পণ্ডিতদের খুঁজে আনার ক্ষেত্রে কোনো পদ্ধতিগত স্বচ্ছতা নেই। তাঁরা কীভাবেই- বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন, উপসংহার ঘোষণা করেন এবং বিশ্বের নানান দেশের পরিসংখ্যানের সঙ্গে ক্রস চেকিং করেন সে বিষয়েও কিছু জানা যায় না। EIU-DI (পূর্বে উল্লেখিত) জানিয়েছে তারা সমীক্ষায় ওয়ার্ল্ড ভ্যালুসার্ভে নামের প্রতিষ্ঠানের কাছে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে। হায়! আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রগুলিতেও বিশ্বের পরিসংখ্যান সংগ্রাহক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়েছি। ২০১২ সালের পর থেকে ভারতের ওপর কোনো নিরীক্ষা বা অন্য সমীক্ষা চালিয়ে সরেজমিনে কোনো তথ্যই সংগ্রহ করা হয়নি।

পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এই তথাকথিত 'বৌদ্ধিক পুকুরগুলি' তাঁদের পরিবেশিত বিভিন্ন দেশের যে স্থান ঘোষণায় অভ্যস্ত সেগুলি সম্পূর্ণ আজগুবি খবর এবং নানান মিডিয়া রিপোর্ট থেকে আহরণ করা হয়। তাও সেই রিপোর্টগুলিকে নানানভাবে দোমড়ানো মোচড়ানো হয় যাতে উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য।

উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, উল্লেখিত ফ্রিডম হাউস ঘোষণা করল ভারতের বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বিভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে এমন নির্দেশ জারি করে যা নারী ও সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত করে। এই সূত্রে ভারতে ২০২১ সালে ৫ জন সাংবাদিকের মৃত্যু বিশ্বের যে কোনো দেশের তুলনায় সর্বাধিক। নিশ্চয়, কিন্তু এর সঙ্গে এটাও বলা উচিত বিশ্বের মোট সাংবাদিকের ১১ শতাংশ এবং ভারতের জনসংখ্যা বিশ্বের ২২ শতাংশ। এর মধ্যে চীনকে বাদ দেওয়া হয়েছে তাদের ওখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কি করা হয় ও কত মারা যায় তার পরিসংখ্যান তারা দেয়নি।

এ বিষয়ে ভারত সরকারকে বিনা বিলম্বে বিশ্বব্যাংককে এই বৌদ্ধিক পাতকুয়াদের সম্পর্কে পর্যাপ্ত অনুসন্ধান করে তাদের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা দরকার। World governance Index অর্থাৎ বিশ্বের প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলি মনগড়া হলে তা ভারত সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে দেশের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি সবেরই ক্ষতিসাধন করবে। একই সঙ্গে বৌদ্ধিক পাণ্ডাদের দায়বদ্ধতা ও দায়িত্ব নিয়েও তাদের কাছে বিশ্বব্যাংকের কৈফিয়ত চাওয়া দরকার। একই সঙ্গে দেশের বুদ্ধিজীবীদেরও এগুলি নিয়ে চর্চার পর বিশ্বের দরবারে সঠিক তথ্য পৌঁছে দিলে তবেই এই মিথ্যার দাপট কমতে পারে।

(সঞ্জীব সান্যাল প্রধানমন্ত্রীর ইকোনমিক অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলের সদস্য এবং আকাঙ্ক্ষা অরোরা ইকোনমিক অ্যাডভাইসারি কাউন্সিলের ডেপুটি ডিরেক্টর)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শোকসংবাদ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর নগরের স্বয়ংসেবক সৌম্যজিৎ সরকারের বাবা সমীরণ সরকার গত ১১ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ অসম প্রান্তের শ্রীভূমি জেলা সঙ্ঘচালক নর্মদা চক্রবর্তীর মাতৃদেবী কাজলবালা চক্রবর্তী গত ২২ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ৩ পুত্র ও পুত্রবধূ, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

কমিউনিজমের সংকট ঘনীভূত

গত শতকের নয়ের দশকের গোড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কোভিড-পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে কমিউনিজমের সামনে পুনরায় সংকট, এবার আরও গভীরতর। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর মূলত চীন-কিউবা কিংবা ল্যাটিন আমেরিকার কিছু দেশ কমিউনিজমের পতাকা বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল। বিশ্বে সামরিক ক্ষেত্রে আমেরিকা বনাম সোভিয়েতের ঐতিহাসিক সংঘর্ষের আবহেই মূলত এই দুই শক্তিধরের সংঘাতের ঐতিহ্য বহন করছিল চীন ও কিউবা। বিশেষ করে, তাদের আমেরিকা-বিরোধী ধুয়ো তোলার সূত্রেই শুধু আমেরিকা নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই সংঘাতের প্রভাব পড়ছিল। পৃথিবীকে অস্থির করে তোলবার জন্য এই দুই কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের প্রভূত অবদান ছিল।

এবার নিজের দেশেরই জনরোষের মুখে পড়েছে এই দুই কমিউনিস্ট শাসিত দেশ। কিউবাতে গত বছর কমিউনিস্ট সরকার-বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সেদেশের জনগণ। এখনো পর্যন্ত কিউবার রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশেষ বদল ঘটেনি ঠিকই, বিশেষ করে সেদেশের কমিউনিস্ট সরকার জনবিদ্রোহকে দমন করতে সমর্থ হয়েছে। পাশাপাশি চীনেও বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল কিছুকাল আগেই, সম্প্রতি পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হয়েছে। সেদেশে মুহুর্মুহু স্লোগান উঠছে রাষ্ট্রপ্রধান শি জিনপিঙ্গের বিরুদ্ধে, শাসক কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। বিদ্রোহের কারণ মূলত কমিউনিস্ট সরকারের কোভিড- নীতির বিরোধিতা। সূত্রের খবর, কোভিড-সংক্রমণ রুখতে চীনের কমিউনিস্ট সরকার যে মাত্রাতিরিক্ত কড়াকড়ি ব্যবস্থা নিয়েছে, তার চাপ নিতে হয়েছে সেদেশের অর্থনীতিকে। অথচ এই কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট অতিদুর্বল অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার কোনো প্রয়াস চীনা-সরকার নেয়নি, বরং সেদেশের জনগণের উপর আর্থিক-নিপীড়ন চালিয়ে মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে।

কোভিডে সারা বিশ্বজুড়েই অর্থনীতির ভিত নড়বড়ে হয়ে গিয়েছে। শাসকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভও কোনো কোনো দেশে ধূমায়িত হয়েছে। যেমন শ্রীলঙ্কা। সেইদিক দিয়ে কিউবা বা সাম্প্রতিক সময়ে চীনে শাসকের বিরুদ্ধে অসন্তোষ কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা নয় ঠিকই, কিন্তু কমিউনিস্ট দেশগুলি অতীতে যে নিষ্ঠুর উপায়ে নিজেদের দেশে জনবিদ্রোহ দমন করেছে, পোস্ট কোভিড-পরিস্থিতিতেও তার ব্যক্তিক্রম হবে না বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কিউবাতে এর কিছুটা আভাস মিলেছে, এখন চীন কী করে তাই দেখার। কিউবার প্রেসিডেন্ট পদে যতদিন ফিদেল কাস্ত্রো ছিলেন, ততদিন জনগণের ওপর থেকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে

> **সারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়েই ভারতে কমিউনিজমের অবস্থা প্রায় দেউলিয়া। শুধু রাজনৈতিকভাবেই নয়, সামাজিকভাবেও। দেশ ও বিশ্বের পক্ষে ক্ষতিকর একটি মতবাদের জন্য এই পরিণতিই হয়তো অপেক্ষা করেছিল।**

কোনো শিথিলতা আনতে দেননি। কিন্তু ২০১৬ সালে তিনি মারা যাবার পর সেদেশের শাসকদল কমিউনিস্ট পার্টি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, কিন্তু শাসনক্ষমতা কায়েম রাখতে জনগণের ওপর প্রশাসনিক ও আর্থিক নিপীড়নও শুরু করে।

চীনেও শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণে ও ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য শ্রমিকদের সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার করা হচ্ছিল। সবচেয়ে বড়ো কথা এই দুই কমিউনিস্ট দেশেরই অভ্যন্তরীন কথা বড়ো একটা বাইরে আনতে পারে না সংবাদমাধ্যম, কারণ তাদের সংবাদ-সংগ্রহের সেই স্বাধীনতা নেই।

বর্তমানে কমিউনিস্ট দেশগুলিতে এই ভয়ংকর গণতন্ত্রহীনতার প্রতিবাদে সাধারণ নাগরিকরা সোচ্চার হওয়ার সাহস দেখাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বের মিডিয়াকেই গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে হবে বলে কূটনীতিবিদরা মনে করেন। চীন হোক বা কিউবা— জনগণের বিপ্লব-মিছিলে একটা সাধারণ জিনিস চোখে পড়েছে। মিছিলে স্লোগান উঠেছে, 'স্বাধীনতা চাই' বলে। সুতরাং অর্থনৈতিক বিপর্যয় এই পরিস্থিতির জন্য যত না দায়ী, বরং কমিউনিস্ট দেশগুলিতে গণতন্ত্রহীনতা, স্বাধীনতাহীনতা কোভিড পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তুমুল জনরোষ উদগীরণে সমর্থ হয়েছে। ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের পর আরও একবার কমিউনিজমের অসারত্ব কোভিড-উত্তর পরিস্থিতিতে প্রমাণিত হলো, বলে তথ্যাভিজ্ঞমহলের ধারণা। এদিকে সারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়েই ভারতে কমিউনিজমের অবস্থা প্রায় দেউলিয়া। শুধু রাজনৈতিকভাবেই নয়, সামাজিকভাবেও। দেশ ও বিশ্বের পক্ষে ক্ষতিকর একটি মতবাদের জন্য এই পরিণতিই হয়তো অপেক্ষা করেছিল। □

জেলকে রিসর্ট বানিয়ে ফেলেছেন নেতারা

অভিরূপ গঙ্গোপাধ্যায়

আম আদমি পার্টির নেতা সত্যেন্দ্র জৈনের চব্যচোষ্য খাওয়ার ভিডিয়ো দেখে এক বৃদ্ধার প্রশ্ন, 'এদের কি লজ্জাশরমও নেই?' আর এক জেলবন্দি মন্ত্রী-কাম-নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আবদার শুনলে বৃদ্ধা কী বলতেন জানা নেই, তবে লজ্জাশরমের কথা নিশ্চয়ই উঠত।

কিন্তু মুশকিল হলো, 'লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়'— এই বাংলা প্রবাদটি রাজনৈতিক নেতা, দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী এবং স্বঘোষিত গুরুরা কায়মনোবাক্যে মেনে চলেন। তার ফলও হাতেনাতে মেলে। কিছুদিন আগেই আম আদমি পার্টির নেতা সতেন্দ্র জৈন এক ধর্ষকের হাতে 'চম্পি' মাসাজ নিয়েছিলেন। ধর্ষণের অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত ওই বন্দিকে ফিজিওথেরাপিস্ট বানাবার চেষ্টা করেও বিশেষ লাভ হয়নি। 'চম্পি' মাসাজের ভিডিয়ো দেখে নেতাকে খুব ট্রোল করেছেন নেটিজেনরা। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হয়নি। ঝুলি থেকে বাঘ বেরনোর মতো বেরিয়ে পড়েছে চব্যচোষ্য খাওয়ার ভিডিয়ো। ভিডিয়োটি দেখে বিজেপির মুখপাত্র শাহজাদ পুনাওয়ালা বলেছেন, 'জেলের বাইরে থেকে দু'জন এসে সত্যেন্দ্র জৈনকে খাবার দিয়ে গেছে। এমন খাবার যা বড়ো বড়ো হোটেল আর রিসর্টেই পাওয়া যায়।' এই ঘটনার পর স্বাভাবিক ভাবেই একটা প্রশ্ন ওঠে, জেল কি তাহলে আর সংশোধনাগার নেই? কারাদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত যে কোনও ব্যক্তি জেলখানায় সব ধরনের আমোদ-প্রমোদ ও আরাম থেকে বঞ্চিত হবেন— এটাই স্বাভাবিক। তা না হলে তারা যে শাস্তি ভোগ করছেন সেটা বোঝাই যাবে না। বিনিময়ে তারা যথার্থ সামাজিক আচরণ শিখবেন, একে অপরের প্রতি সহিষ্ণু ও সহমর্মী হবেন--- এমনটাও আশা করে ভারতের বিচারব্যবস্থা। কিন্তু বাস্তবে হচ্ছে উলটো। দেখা যাচ্ছে ভারতীয় কারাগারগুলিতে সাধারণ কয়েদিদের জন্য এক ধরনের ব্যবস্থা আর ভিআইপি কয়েদিদের জন্য অন্যরকম।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও এসএসসি দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও জেল কর্তৃপক্ষের কাছে অদ্ভুত দাবি করেছেন। তাঁর দাবি তাঁকে রোজ চার পিস মাছ এবং ছ'পিস মাংস দিতে হবে। পার্থবাবুর অভিযোগ তিনি জেলে সব থেকে বেশি খরচ করেন, তাহলে কেন বেশি সুযোগ সুবিধা পাবেন না? জেলে কী কারণে তাকে খরচ করতে হয় সেটা স্পষ্ট নয়। জেল কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে খোলসা করে কিছু বলেননি। তবে পার্থবাবুর আচরণে তারা যে ক্ষুব্ধ তাও গোপন করেননি। তাদের এই ক্ষোভ অন্যায় কিছু নয়। কারণ খাওয়া নিয়ে হরেক কিসিমের আবদারই শুধু নয়, আরও নানা কারণে জেলের সাধারণ রক্ষী থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা পর্যন্ত পার্থবাবুর ওপর বিরক্ত। উদাহরণস্বরূপ, পার্থবাবুর স্নান করা নিয়ে বায়নার কথা বলা যেতে পারে। জেলের নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক সেলের বাইরে জলের ড্রাম থাকে। ড্রাম থেকে মগে করে জল তুলে কয়েদিরা স্নান করেন। পার্থবাবুও এতদিন তাই করেছেন। কিন্তু হঠাৎ তার কী খেয়াল হয়েছে কে জানে, দাবি করেছেন, জেল কর্তৃপক্ষকে একজন কর্মী নিয়োগ করতে হবে যিনি প্রতিদিন ড্রাম থেকে মগে করে জল তুলে পার্থবাবুকে স্নান করিয়ে দেবেন। মামার বাড়ির আবদার বলে যে কথা প্রচলিত রয়েছে পার্থবাবু তার একেবারে হদ্দমুদ্দ করে ছেড়েছেন। এমনিতেই তৃণমূল দল এবং এই দলের নেতারা ক্ষমতার অপব্যবহার কীভাবে করতে হয় তা প্রমাণে সদাই সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় যখন দেখি মন্ত্রীপদ-সহ দলের সমস্ত দায়িত্ব থেকে অপসারিত একজন ব্যক্তি জেলখানায় বসে মামার বাড়ির আবদার করার সাহস পান কোথা থেকে? কে তাকে সাহস জোগায়?

সত্যেন্দ্র জৈন বা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জেলখানায় রাজকীয় জীবনযাপন নিয়ে আজকাল হইচই হচ্ছে বটে কিন্তু এই ঘটনা মোটেই নতুন নয়। বস্তুত, ভারতবর্ষের কংগ্রেস-নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই এই 'সিস্টেম' একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনে ব্রিটিশ জেলখানায় নেতা-নেত্রীকে অকথ্য অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল কিন্তু গান্ধীজী ও নেহরুর প্রতি ব্রিটিশ শাসক ছিল আশাতিরিক্ত উদার। রাজবন্দি থাকার সময় সাভারকর জেলখানায় ঘানি টেনেছেন কিন্তু নেহরু বই লিখেছেন। ব্রিটিশ যদি সদয় না হতো তাহলে নিশ্চয়ই নেহরু জেলে বসে সাহিত্যচর্চা করতে পারতেন না। অর্থাৎ আইনের চোখে সবাই এক হলেও আইনের দেওয়া শাস্তি কে কতটা ভোগ করবে তা অনেকাংশে নির্ভর করে আইনেরই রক্ষকদের ওপর। তাদের একবার হাত করতে পারলে

ভারতীয় কারাব্যবস্থার হালহকিকত দেখে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের পর্যবেক্ষণ আজও সমানভাবে সত্য। এখনও বড়োলোকেরা আইনকে তামাশা বানিয়ে চলেছেন। সমগ্র বিচারব্যবস্থার এর থেকে বড়ো অপমান বোধহয় আর কিছুই নেই।

ফঃ ২

সংশোধনাগারকে বাগানবাড়ি বানাতে বেশি সময় লাগে না।

বিগত কয়েকদশকে রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে ঘোরাফেরা করা অনেকেই এই সিস্টেমের সুযোগ নিয়েছেন। এদের মধ্যে বেশিরভাগই রাজনৈতিক নেতা। কয়েকজন দুর্নীতিগ্রস্ত শিল্পপতি ও স্বঘোষিত গডম্যানও আছেন। উদাহরণস্বরূপ, তামিলনাড়ুর প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার ডানহাত ভি.কে. শশীকলার নাম করা যেতে পারে। দক্ষিণের দাপুটে এই নেত্রীর বিরুদ্ধে অর্জিত সম্পদ ও আয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকার অভিযোগ ছিল। অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত কারাদণ্ডের আদেশ দেয়। এরপর শুরু হয় আসল নাটক। শশীকলার যাতে কোনও অসুবিধে না হয় তার জন্য বেঙ্গালুরুর পারাপ্পানা অগ্রহারা সেন্ট্রাল জেল কর্তৃপক্ষ আলাদা কিচেনের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। জেলে শশীকলা নিজের পছন্দমতো পোশাক পরতেন এবং পছন্দের খাবার রান্না করে খেতেন। শুধু তাই নয়, শশীকলার বিরুদ্ধে আর একটি গুরুতর অভিযোগ, জেলের পরিবেশ নিজের পছন্দসই বানানোর জন্য তিনি কর্তৃপক্ষকে ২ কোটি টাকা দিয়েছিলেন। এই ঘটনা জানাজানি হবার পর তদন্ত শুরু হয়। তদন্তকারী দল জেলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হয় যে অভিযোগ মিথ্যে নয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো জেলকে ফাইভস্টার রিসর্ট বানানোর জন্য দায়ী কারা? আইনের সাজাপ্রাপ্ত এইসব ভিআইপি কয়েদিরা, নাকি জেল কর্তৃপক্ষ? আরও কয়েকটি ঘটনার কথা আলোচনা করলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

সাহারা পরিবারের সুব্রত রায়ের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। বিনিয়োগকারী ও ব্যাংকের প্রাপ্য ২০,০০০ কোটি দিতে না পারার জন্য তার কারাদণ্ড হয়েছিল। তাকে রাখা হয়েছিল তিহার জেলে। সুব্রত রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ, জেলে স্রেফ আরামে থাকবেন বলে তিনি কর্তৃপক্ষকে রোজ ৫৪, ০০০ টাকা দিতেন। সাতান্ন দিনের কারাবাসে তার মোট খরচ হয়েছিল ৩১ লক্ষ টাকা। বিনিময়ে তিনি পেয়েছিলেন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সেল, কমোড, ওয়াইফাই ও ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের সুবিধা। অন্যায় সুবিধা নেওয়ার জন্য সুব্রত রায়কে যদি দায়ী করা হয় তাহলে প্রশ্ন উঠবে জেল কর্তৃপক্ষই-বা পার পাবেন কী করে? কিংবা, যে রাজনৈতিক গডফাদারেরা সুব্রত রায়কে এই বেআইনি সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিলেন তাদেরই-বা ধোয়া তুলসীপাতা মনে করে ছেড়ে দেওয়া হবে কেন?

অন্যায় সুবিধা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সমাজবাদী নেতা অমর সিংহের বিরুদ্ধেও। যদিও তার তরফে যুক্তি দেওয়া হবে ভোট কেনা-বেচা জনিত কেলেঙ্কারির কারণে যখন তার কারাদণ্ড হয় তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন। অসুস্থতার কারণেই অমর সিংহকে স্পেশ্যাল ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল। তিনি বাড়িতে তৈরি খাবার খেতেন, পশ্চিমি ধাঁচের টয়লেট ব্যবহার করতেন। দু'জন বন্দি সবসময় সেলে হাজির থাকতেন অমর সিংহের অভাব-অভিযোগ শোনার জন্য। অসুস্থতার ব্যাপারটি মাথায় রাখলে অমর সিংহকে ক্লিনচিট দেওয়া যেতে পারে। যদিও প্রশ্ন ওঠে একজন সাধারণ কয়েদি যদি অসুস্থ অবস্থায় জেলে আসতেন তাদের কি এইসব সুবিধা দেওয়া হতো? নিশ্চয়ই হতো না। হওয়াটা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। কিন্তু ভিআইপি কয়েদিদের ক্ষেত্রে এই উচিত-অনুচিত বোধ কাজ করে না। অমর সিংহের বেলায় করেনি, লালুপ্রসাদ যাদবের বেলাতেও না। ২০১৩ সালে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়ে লালুপ্রসাদ যখন তিন মসের জন্য বীরসা মুণ্ডা সেন্ট্রাল জেলে যান তখন তিনি মোটেই অসুস্থ ছিলেন না। অথচ তাঁর সেলে টিভি ছিল, দু'জন ব্যক্তিগত রাঁধুনি ছিলেন— যারা লালুপ্রসাদের পছন্দের খাবার বাড়িয়ে দিতেন। কী থাকত লালুপ্রসাদের মেনুতে? ভাত, টাটকা শাকসবজি, মটন অথবা চিকেন ও মাছ। সঙ্গে ঘি এবং নানারকম মরসুমি ফল। জেলে কেউ দেখা করতে এলে নির্ধারিত সময়ের থেকে অনেক বেশি সময় ধরে লালুপ্রসাদ তার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। সন্ধ্যের পর অন্য কয়েদিরা যখন যে যার সেলে ফিরে যেতেন লালুপ্রসাদ দিব্যি বাইরে থাকতেন। তবে সব থেকে বড়ো সুবিধা হলো যে কোনও সময় শারীরিক কারণ দেখিয়ে জেলের বাইরে চলে যাবার স্বাধীনতা। লালুপ্রসাদের বিরুদ্ধে যাঁরা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁরাই সম্ভবত তাঁকে বুঝিয়েছিলেন বাড়ির জীবন আর জেলবন্দি জীবনে বিশেষ কিছু পার্থক্য নেই। অন্তত কংগ্রেসের নেকনজরে যারা থাকবেন তাদের জন্য একেবারেই নেই।

রাজনৈতিক নেতা ও শিল্পপতিদের পাশাপাশি গুরমিত রামরহিম সিংহ ও আশারাম বাপুর কথা বলা যেতে পারে। এরা স্বঘোষিত গডম্যান। দু'জনেই ধর্ষণের অভিযোগ কারাবাস করছেন। কিন্তু কারাদণ্ড ভোগ করছেন কি? না, তা করেননি। কারাগারে তোফা আরামেই এরা আছেন। ঠিক যেমন সত্যেন্দ্র জৈন বা পার্থ চট্টোপাধ্যায়রা আছেন। প্রশ্ন হলো, কারাগারে এই বৈষম্য কেন? বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'আইন! সে তো তামাশামাত্র। বড়োলোকেরা পয়সা খরচ করিয়া এই তামাশা দেখে।' ভারতীয় কারাব্যবস্থার হালহকিকত দেখে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের পর্যবেক্ষণ আজও সমানভাবে সত্য। এখনও বড়োলোকেরা আইনকে তামাশা বানিয়ে চলেছেন। সমগ্র বিচারব্যবস্থার এর থেকে বড়ো অপমান বোধহয় আর কিছুই নেই। □

With Best Compliments from -

A Well Wisher

উত্তর-পূর্বে টাকার লোভ দেখিয়ে ধর্মান্তরণ

নিখিল চিত্রকর

হানা মাইকেলা, মারকাস আবনি হেনরিক, সুজানা এলিজাবেথ।

গত ২৫ অক্টোবর অসম পুলিশ ৩ জন সুইডিশ খ্রিস্টান মিশনারিকে গ্রেপ্তার করে। যারা টুরিস্ট ভিসায় ভারতে ঘুরতে আসার নামে উত্তর-পূর্ব ভারতের জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করছিল। তাদের মধ্যে দুজন আবার মহিলা। হানা মাইকেলা, মারকাস আরনি হেনরিক ব্লুম এবং সুজানা এলিজাবেথ হাকানাসনকে অসমের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির করানো হয়। এই তিন খ্রিস্টধর্ম প্রচারক ভারতের ভিসা আইন লঙ্ঘন করে ডিব্রুগড়ের নাহারকাটিয়া এলাকায় তিনদিন ধরে চলা একটি খ্রিস্টান ধর্ম সম্মেলনে সক্রিয় অংশ নেয়। বক্তব্য রাখে। শুধু তাই নয়, খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে কী কী সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় তা মাইক ধরে ব্যাখ্যা করে। তাদের লক্ষ্য ছিল স্থানীয় চা বাগানের জনজাতি ও সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষজনকে ধর্মান্তরিত করা।

ভারতে এসে খ্রিস্টান মিশনারিদের এই Proselytisation বা ধর্মান্তরণ নতুন নয়। সেই ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা- গামা কালিকট বন্দরে হাজির হয়ে ইউরোপ থেকে ভারতে আসার পথ আবিষ্কার করে ফেললেন। তারপর থেকে দলে দলে ইউরোপীয়রা ভারতীয় উপমহাদেশে তাঁবু ফেলতে শুরু করে। সেই দলে বেশিরভাগই ছিল ব্যবসায়ী। ধর্মবিস্তারের দিকে তাদের তেমন নজর ছিল না। ১৫০০ সাল থেকে বিভিন্ন ক্রুসধারী যাজকের দল ফ্রান্সিকান, ডোমিনিকান, অগাস্টিনিয়ান ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পর্তুগাল থেকে ভারতে এসে পর্তুগিজ শাসিত সমুদ্রোপকূলীয় জেলাগুলোয় গির্জা নির্মাণ করতে থাকেন। ১৫৩৭ সালে তৎকালীন অবিভক্ত বাঙ্গলার চট্টগ্রাম ও সাতগাঁয়ে উপনিবেশ স্থাপন করে পর্তুগিজরা। ফাদার মাইকেল ডি'রোজারিও-র 'বাংলাদেশে খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিহাস' বইটিতে ফাদার জুলিয়ানো পেরেরার উল্লেখ আছে। যিনি ১৫৩৭ সালে হুগলীর কাছে সাতগাঁয়ে একটি গির্জার দায়িত্বে ছিলেন। অনুমান করা যায় সেই সময় থেকেই মিশনারিরা ভারতে ধর্মান্তরণের দিকে শ্যেন দৃষ্টি দেয়।

গোড়ার দিকে ভারতীয় সমাজে কর্মভেদে শ্রেণীগত বিন্যাসের (চতুরাশ্রম প্রথা) যে ন্যারেটিভ তাকেই হাতিয়ার করতো ইউরোপীয় যাজকেরা। একেবারে প্রান্তিক অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ ছিল তাদের সফট টার্গেট। ভারতের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষের কাছে দারিদ্র্য হলো সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ। স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরসা মুণ্ডাও দারিদ্র্যের কারণে খ্রিস্টান হয়েছিলেন (The Dust Storm And The Hanging Mist — Kumar Suresh Singh, 1966)। পরে তিনি ব্রিটিশদের প্রতারণা বুঝতে পারেন। এইভাবে গরিবি মোচনের দোহাই দিয়েই সূচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরতো মিশনারিরা। ফলস্বরূপ গাঁয়ের পর গাঁ চলে গেল প্রভু যীশুর শরণে। শুরু হলো গির্জা ও যাজকদের বাড়বাড়ন্ত। 'নেটিভ'দের ধর্মান্তরিত করার সেই ট্র্যাডিশন আজও চলেছে। কোথাও কোথাও তার মোডাস অপারেন্ডি একটু বদল হয়েছে।

ডিব্রুগড়ের নাহারকাটিয়ায় গ্রেপ্তার হওয়া তিন সুইডিস প্রিচারস (খ্রিস্টান প্রচারক) ঘিনাইয়ে একটি চা-বাগান লাগোয়া এলাকায় ধর্মীয় সম্মেলনে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করছিলেন। স্থানীয় চার্চ অ্যাসোসিয়েশনের তরফে চা-বাগানের শ্রমিকদের টাকাও বিলি করা হয়। এই 'টাকার লুঠ' দেওয়ার মাধ্যমে আসলে জনজাতি শ্রমিকদের ব্যাপ্টিজমের নাগপাশে বেঁধে ফেলা একরকম কনফার্ম হয়ে গেল। শুধুমাত্র ধর্মান্তরণের উদ্দেশে এদেশের চার্চ, মিশনারি স্কুল ও চ্যারিটি মিশনগুলিতে বিনিয়োগ হয় কাঁড়ি কাঁড়ি বিদেশি টাকা। সেই টাকার দৌলতে মিশনারিরা ভারতের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে গিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। কোথাও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের সেবা করছে, কোথাও ইংরেজি স্কুল তো কোথাও হিলিং সেন্টারের ফাঁদ পেতে সনাতন ধর্মের মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থাগুলি।

হিলিং সেন্টারের কথায় মনে পড়লো বেশ কয়েকবছর আগে পরিচয় হয়েছিল রাম অবতারের সঙ্গে। ছেলেটি মধ্যপ্রদেশের দলিত সম্প্রদায়ের। ওর কথায় মহাদলিত। আইআইটি পাশ করে সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে নামকরা সংস্থায় চাকরি করত। দলিত হওয়ায় আগে থেকেই কোথাও একটা হীনমন্যতা ছিল রাম অবতারের মধ্যে। প্রোজেক্টে কোথাও একটা ভুল হলে তার ওপরওয়ালা তাঁকে ভর্ৎসনা করত। সবার সামনেই কথা শোনাতো। ইনক্রিমেন্ট পেত

না। কয়েকবছর কাটিয়ে দেওয়ার পরও অফিসে প্রোমোশন হলো না। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছিল রাম। সেই সময় অফিসেরই এক সিনিয়র কলিগ অঞ্জলি সোরেন একদিন তাঁকে ফাইভ স্টার হোটেলে একটা পার্টিতে নেমন্তন্ন করল। বলল, এসো ভালো লাগবে। রাম অবতার গঙ্গার পাড়ে ফাইভ স্টার হোটেলে পৌঁছে অবাক হয়ে গেল। ঝাঁ চকচকে ব্যাপার স্যাপার, সঙ্গে দেদার খানাপিনা। এসবের মধ্যে রাম অবতার দুঃখ, মনখারাপ সব ভুলে গেল। পরের সেশনে কোট-প্যান্ট পরা এক প্রিচার্স মাইক হাতে নানারকম 'ইন্সপিরেশনাল বাণী' আওড়ে গেলেন। উপস্থিত সবাই 'ও জিসাস, ও জিসাস' বলে হেদিয়ে মরলো। পার্টির শেষে অঞ্জলি সোরেন রাম অবতারকে নিয়ে গেল সেই প্রিচার্স ক্রিস্টোফারের কাছে। রামের কথা শুনে উনি বললেন, "তুমি দলিত বলেই ওরা তোমাকে আন্ডারএস্টিমেট করছে। তোমার যোগ্য পাওনা থেকে তোমায় বঞ্চিত করছে। তুমি যীশুর শরণাপন্ন হও। ওনার কাছে সব সমান। আমাদের সঙ্গে এলে সব পাবে। অনেক উন্নতি করবে। টাকা, বান্ধবী, বিদেশে চাকরির সুযোগ— সব কিছুই প্রভু যীশু তোমায় দেবে।" এসবই যে আসলে ধর্মান্তরণের টোপ তা বুঝে উঠতে কিছুটা সময় লেগেছিল রাম অবতারের। সে এয়ারপোর্টের কাছে কেষ্টপুরের একটা চার্চে নিয়মিত যেতেও শুরু করেছিল। এমনকী চার্চের সহচরদের সঙ্গে সে ড্রাগের নেশা ধরে ফেলেছিল। শেষে অফিসের এক সিনিয়র দাদার মাধ্যমে বেলুড় মঠে সর্বপ্রিয়ানন্দ মহারাজের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। ঠাকুরের অমৃতবাণী আমূল পরিবর্তন এনেছিল রাম অবতারের জীবনে। না, সে খ্রিস্টান হয়নি। তার আলগা শিকড় আরও মজবুত হয়েছে।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, সবাই কিন্তু রাম অবতারের মতো পথ প্রদর্শক পায় না। অধিকাংশ মানুষকেই তার গরিবি ঘোচানোর সুযোগে ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান মিশনারিরা। কলকাতার শিয়ালদায় ঢিল ছোড়া দূরত্বে নামকরা একটি ইংরেজি মাধ্যম মিশনারি স্কুল। এখানে পড়তে হলে খুব কাঠখড় পোড়াতে হয় শুনেছি। স্কুলটির আলাদা একটা চ্যারিটি সেকশনও রয়েছে। একটা অ্যানুয়াল ফাংশানে গিয়ে দেখেছিলাম সেখানে সাহেব-মেমদের আনাগোনা। সেখানে অনাথ বাচ্চাদের জন্য আবাসিক শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে। সারা রাজ্য থেকে খুঁজে খুঁজে অনাথ বাচ্চাদের এখানে নিয়ে এসে পড়াশোনা করানো হয়। গ্র্যাজুয়েশনের পর তাদের মধ্যেই অনেককে ইউরোপিয়ান দেশে পাঠানো হয় উচ্চশিক্ষার পাঠ নিতে। এরকমই একজন সিস্টার মেরির সঙ্গে কথা হয়েছিল। পুরো নাম মেরি সিলভান হেমব্রম। বলাবাহুল্য, তথাকথিত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তিনি প্রথমেই স্বধর্ম থেকে পতিত হয়েছেন। যদিও প্রোগ্রেসিভ মাইন্ডেড সেকুলারপন্থীরা এই ধর্মান্তরণে মাহাত্ম্য খুঁজতে মোমবাতি হ্যারিকেন হাতে পথে নামবেন। পইতে পোড়ানো মেকলে সন্তানদের প্রচ্ছন্ন মদতেই মেরিদের মতো দেশীয় খ্রিস্টানদের এদেশে ধর্মান্তরণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এরা অঞ্জলি সোরেনদের মতোই প্রসেলিটাইজেশন এজেন্ট। এভাবেই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, হিলিং সেন্টার, মিশনারি মদতপুষ্ট কিন্ডারগার্টেন, প্লে-স্কুলে পাতা রয়েছে ধর্মান্তরণের ফাঁদ। ফরেন ফান্ডিঙের আনুকূল্যে এই সংস্থাগুলি নানাধরনের টোপ দিয়ে প্রান্তিক জনসাধারণকে বিশেষ করে জনজাতিদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করছে। সারা ভারতে ব্যাঙের ছাতার মতো আনাচেকানাচে গজিয়ে উঠছে গির্জা। সেখানে পশ্চিমি কালচার, খানাপিনা ও সপ্তাহান্তে নজরকাড়া কার্নিভাল। যা দেখে মানুষ একরকম কনভিন্সড হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতে এদের বাড়বাড়ন্ত দেখলে অবাক হবার জোগাড়। একসময় অসমের শ্রীমন্ত শঙ্করদেবকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব ও ক্ষত্রিয় সংস্কৃতির জাগরণ হয়েছিল সারা উত্তর-পূর্ব ভারতে। তাঁর প্রবর্তিত নববৈষ্ণব ধর্মমত বা একশরণ ধর্মমতের ভাবধারায় উত্তাল হয়েছিল সেভেন সিস্টার স্টেটস। কিন্তু আজ অসম -সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের অন্যান্য অংশে ৬৬টির বেশি চার্চ রয়েছে। অথচ বৈষ্ণব মঠগুলির সংখ্যা মাত্র ৩৪টি।

অসমের রাজধানী দিশাপুর থেকে মাত্র

৩০ কিলোমিটার দূরে পাহাড় ঘেরা আমসাং জঙ্গল। সেখানে তিনটি গ্রামে গারো জনজাতির ১৩০টা হিন্দু পরিবারের বাস। গ্রামগুলো পাহাড়ের উপর হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ততটা মসৃণ নয়। প্যানডামিকের সময় একদল মিশনারি এই গ্রামগুলোয় এসে পরিবারগুলোর খাবার, ওষুধ, মাস্ক এমনকী ভ্যাক্সিনেরও ব্যবস্থা করে দেয়। সেই ফাঁকে শুরু হলো ধর্মান্তরণ ব্যবসার খেলা। শীতকালে কিছু অ্যালুমিনিয়াম সিটের ছাউনি, কম্বল আর গরম জামাকাপড়ের ভেট দিয়ে যাজকেরা এসে গারো পরিবারগুলোকে ধর্মান্তরিত করে ফেলল। ১৩০টি পরিবারের মধ্যে ১২৮টি পরিবার রাতারাতি খ্রিস্টান হয়ে গেল। পরে ধর্মান্তরিত ১২৮টি খ্রিস্টান পরিবার ও মিশনারিদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাকি দুটি হিন্দু পরিবারকে খ্রিস্টমতে দীক্ষিত হতে চাপ দিতে লাগল। নইলে তাদের এই তল্লাট ছেড়ে অন্যত্র উঠে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হলো। সম্পাথার, লংডাংগুড়ি ও সুয়ালি লুকুয়া খাল- আমসাং জঙ্গলের এই তিনটে গ্রামই

এখন পুরোপুরি কনভার্টেড। এইভাবে নজরানা দিয়ে হিন্দু থেকে খ্রিস্টান করার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় প্রতিবাদ করেছে হিন্দু সংগঠনগুলি। এমনকী যেসব এলাকার প্রান্তিক হিন্দুদের মধ্যে টাকার প্রলোভনে ধর্ম পরিবর্তন করার প্রবণতা রয়েছে, সেখানে প্রান্তিক জনজীবনের মানোন্নয়নের জন্য অনেক হিন্দু সংগঠন কাজ করছে। বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, সেবা ভারতী, ওয়ার্ল্ড হিন্দু ফেডারেশন, হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, সীমান্ত চেতনা মঞ্চ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মতো সংগঠনের সক্রিয় ভূমিকার জন্য রিলিজিয়াস কনভার্সনের গতিতে একটু হলেও বাধা পড়েছে। যেকারণে খ্রিস্টান হওয়ার আবেদন জানিয়ে বিজ্ঞাপনের পথ ধরতে হচ্ছে মিশনারিদের।

এই কাজে তারা ব্যবহার করছে মুম্বাই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় মুখগুলো। ২০২০তে ইউটিউব, ফেসবুকে কমেডিয়ান জনি লিভারের একটি ভিডিয়ো ক্লিপিং ঘোরাফেরা করছিল। সেখানে জনিকে বলতে শোনা যায়, হাতে সিনেমার কাজ না থাকায় তিনি মানসিক অবসাদে ডুবে যান। তার জন্য মাদক নিতে শুরু করেন। একসময় গুরুতর পেটের অসুখে যখন মরণাপন্ন জনি, তখন একদিন হাসপাতালের বেডে স্বয়ং যীশু এসে তাঁর রোগ নিরাময় করেছেন। তারপর থেকে আবার জনির হাতে কাজ আসতে শুরু করল। তার জীবন আবার স্বাভাবিক হলো। এইভাবে খ্রিশ্চিয়ানিটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাস্যাডর হিসেবে আমাদের চেনাজানা বহু জনপ্রিয় মুখকে মোটা টাকা দিয়ে পুষছে মিশনারিরা। সম্প্রতি আমাজনের মতো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলোও ধর্মান্তরণের খেলায় মিশনারিদের খুল্লামখুল্লা সাপোর্ট করছে। ইউরোপের অ্যামেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশনের(এবিএম) ধর্মান্তরণ মডিউলে অর্থের যোগান দিচ্ছে আমাজন অনলাইন শপিং প্ল্যাটফর্ম। এর সঙ্গে রয়েছে আরও নামিদামি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। যারা বড়ো আকারে খ্রিস্ট ধর্মের প্রচারের জন্য ও ধর্মান্তরণ করতে আমেরিকান ব্যাপ্টিস্ট মিশনের (এবিএম) মতো সংগঠনে টাকা ঢালতে লক্ষ লক্ষ ডলার ভারতে পাঠাচ্ছে।

ভারতে মাস কনভার্সানের জন্য অল ইন্ডিয়া মিশন নামে একটি আলাদা সংস্থা তৈরি করেছে এবিএম। সঙ্গে জোট বেঁধেছে আমাজন। তাদের আমাজন স্মাইল নামে একটা সিস্টার কনসার্ন আছে। আমাজনে বিশেষ অফারে কিছু প্রোডাক্ট কিনলে তার টাকা আমাজন স্মাইলের হাত ঘুরে চলে যায় অল ইন্ডিয়া মিশনের অ্যাকাউন্টে। নরেন্দ্র মোদী সরকার বিদেশ থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় টাকার জোগানে নজরদারির ব্যবস্থা করেছে। কারণ বিগতদিনে এই ধরনের ফরেন ফান্ডের সঙ্গে টেররিজমের যোগ পাওয়া গেছে। যার জন্য ফরেন কন্ট্রিবিউশন রেগুলেটিঙের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা জারি করেছে কেন্দ্র। বসে নেই মিশনারিরাও। এফসিআর-এর মাধ্যমে টাকা পাঠানোর প্রতিবন্ধকতা থাকার দরুন তারা এখন বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা ও ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলিকে কাজে লাগাচ্ছে ফান্ডিঙের জন্য। হালে অরুণাচল প্রদেশের সোশ্যাল জাস্টিস ফোরাম আমাজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে।

ধর্মান্তরণের লক্ষ্য শুধুমাত্র ভারতে খ্রিস্টান ধর্মের রমরমা বৃদ্ধি নয়, এর উদ্দেশ্য আরও গভীর। প্রথম উদ্দেশ্য, ভারতের সনাতন ধর্মের শিকড়টাকে ধীরেধীরে আলগা করা। সেই সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক ও শৈক্ষিক বুনিয়াদকে ক্রমাগত আঘাত করা। যার সরাসরি অভিঘাত গিয়ে পড়বে এদেশের রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর ওপর। অদূর ভবিষ্যতে যদি এভাবেই ধর্মের নামে লড়াই বা ক্রুসেড পরিস্থিতি তৈরি করে দেওয়া যায় তবে বিশ্ব মানচিত্রে ভারতের উত্থান আরও একবার রুখে দেওয়া যাবে। সেই লক্ষ্যেই 'নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে নিঃশ্বাস'। তবে আলোর দিশা দেখাচ্ছে একটি পরিসংখ্যান। ২০০১ সালে মোট জনসংখ্যার শতাংশের ভিত্তিতে ভারতে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জনসংখ্যা ছিল ২.৩৪ শতাংশ। ২০২১-এ তা হয়েছে ২.৩০ শতাংশ। পরিসংখ্যানে সন্তুষ্ট না থেকে অন্য ধর্মের প্রলোভন থেকে হিন্দুদের আগলে রাখার দিকে নজর দিতে হবে। তার জন্য করণীয় সবকিছুই প্রশংসনীয়। □

পুলিশের কামড় বাঙ্গলার সংস্কৃতিকে কলঙ্কিত করল

মণীন্দ্রনাথ সাহা

ছাত্রাবস্থায় একটা কবিতা পড়েছিলাম। কবিতা কবির নাম আজ আর মনে নেই। কিন্তু কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখনও মনে রয়ে গেছে। সেটি হলো— 'কুকুরের কাজ কুকুর করেছে/ কামড় দিয়েছে পায়/তা বলে কি কুকুরকে কামড়ানো/মানুষের শোভা পায়?' কুকুর যে মানুষ বা অন্য পশুকে কামড়াবে তাতে অস্বাভাবিকতা নেই। কুকুরের মধ্যে রকমফের আছে। যেমন— বাড়ির পোষা কুকুর, রাস্তার কুকুর অর্থাৎ যার কোনো মালিক নেই এবং পাগলা কুকুর। তবে সবচেয়ে বেশি ভয় পাগলা কুকুরকে নিয়ে। কেননা পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়। কিন্তু সরকারি উর্দিধারীরা এখন মানুষকে কামড়াতে শুরু করল কেন?

ইতিপূর্বে আন্দোলনরত চাকরি প্রার্থীদের ওপর পুলিশের লাঠি দিয়ে আক্রমণের ঘটনা শহরবাসী প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু কামড়ে দেওয়া এই প্রথম। আর তা নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে রাজ্য জুড়ে। সম্প্রতি কলকাতায় এক পুলিশকর্মী চাকরিপ্রার্থী এক আন্দোলনকারীকে কামড়ে দেন। তারপর থেকেই রাজ্য জুড়ে আন্দোলনের ঝড় উঠেছে। ঝড় উঠেছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও। এমনকী শাসকদলের নেতা সৌগত রায়ও বলেছেন— 'এই ঘটনা পুলিশের ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করেছে। বিষয়টি পুলিশের তদন্ত করে দেখা উচিত।' তিনি আরও বলেছেন, 'এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। না হলেই ভালো হতো।'

বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে স্পষ্ট দেখা গিয়েছে, ওই পুলিশকর্মী আন্দোলনকারীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তাঁকে কামড়ে দিছেন। একাধিক সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ভাইরাল হতে দেখা গিয়েছে। পুলিশ দাবি করেছে, পুলিশকর্মী ওই মহিলাকে কামড়ে দিলেও আন্দোলনকারীরও যথেষ্ট দোষ ছিল। এ প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী বলেছেন, 'পুলিশ আন্দোলনকারীকে কামড়ে দিচ্ছে। আন্দোলনের অধিকার তো সবার আছে। কিন্তু মহিলাকে কামড়ে দিতে হবে, এ শিক্ষায় কেন শিক্ষিত হতে হলো পুলিশকে? মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিবাদ নেই। নিশ্চুপ কেন? বাঙ্গলা আর কত নীচে নামবে?'

আশ্চর্যের বিষয় হলো, যে চাকরিপ্রার্থী আন্দোলন করতে গিয়ে পুলিশের কামড় খেলেন তাকেই গ্রেপ্তার করা হলো। অথচ যিনি কামড়ালেন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলো না। চারিদিকে প্রশ্ন উঠেছে, পুলিশের কামড় খাওয়া সত্ত্বেও চাকরীপ্রার্থী অরুণিমা পালকে হাসপাতালে ভর্তি না করে কামড়ে দেওয়া অভিযুক্ত পুলিশকর্মী ইভা থাপাকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হলো কেন?

আদালতে আইনজীবীরা পুলিশের উদ্দেশে বলেছেন, 'পুলিশ যাঁকে কামড়েছে তিনি লকআপে রয়েছেন অথচ যিনি কামড়েছেন তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সরকার চাকরি দিতে পারছে না। দুর্নীতি করে নেতা-মন্ত্রীরা জেলে রয়েছেন। চাকরিপ্রার্থীরা তো আর মাওবাদী নন। তাঁদের পুলিশ হেফাজত দেওয়া হলে সমাজের প্রতি অবিচার করা হবে।' সরকারি আইনজীবী তখন বলেন, 'আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে উঠেছিল। পুলিশ তাদের কর্তব্য করেছে। শিক্ষকদের শিক্ষকের মতো আচরণ করা উচিত।' পালটা চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী বলেন, 'আন্দোলনকারীরা হিংসাত্মক হলে তাঁদের হাতে লাঠি থাকত। কামড়াচ্ছে তো পুলিশ। রক্ষকই ভক্ষক হয়ে গিয়েছে। আক্রান্ত হয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁদের জামিনের আবেদন করছি। সওয়াল জবাবের পর বিচারক ধৃত ত্রিশজনকে জামিন দেন।

এই ঘটনার পর অনেকেই বলেন যে, রাজ্যের শাসকদলের ওপরতলা থেকে নীচু তলা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ডুবে গেছে। বড়ো বড়ো নেতা-মন্ত্রী, সরকারি আধিকারিকরা দুর্নীতির দায়ে জেলে রয়েছেন। ইডি-সিবিআইয়ের তদন্তে প্রতিদিন দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নতুন নতুন তথ্য সামনে আসছে। তার ওপর শাসক দলের মধ্যেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করেছে। বিরোধীদের প্রবল চাপ এবং প্রায়দিন আদালতের থাপ্পড় খেতে খেতে শাসকদলের নেতা এবং তাদের পোষ্য পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এই সমস্ত চাপ আর তারা নিতে পারছে না। তাই পুলিশ আন্দোলনকারীদের কামড়াচ্ছে, হাফ মন্ত্রীরা দেশের রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ করে কুরুচিকর মন্তব্য করেছেন। তবুও রাজ্যের প্রধান শাসক চুপ করে রয়েছেন। আর মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন বাঙ্গলার বিখ্যাত বিখ্যাত সব বিদ্বজ্জন তথা সুশীল সমাজ। কী ভয়ংকর পরিস্থিতি আজ গর্বের বাঙ্গলার। □

শ্রদ্ধাকে খুন করা হয়েছে জানত আফতাবের পরিবার

শ্রীতমা পাল

একটি চাঞ্চল্যকর তথ্যে প্রকাশ পেয়েছে, দেশজুড়ে কমপক্ষে ১০০০টি মামলা দায়ের হয়েছে যেখানে অমুসলমান মেয়েদের প্রেমের জালে ফাঁসিয়ে বিয়ে করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে এবং সন্তান হওয়ার পরে সেই ছেলেটি আবার অন্য কাউকে বিয়ে করেছে। এই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে এই সমস্ত কিছু 'লাভ জিহাদ' নামক একটি নেটওয়ার্কের অধীনে চলছে, যা অন্যান্য সম্প্রদায়ের মেয়েদের ইসলামে ধর্মান্তরণের র‍্যাডিকাল ইসলামিক ষড়যন্ত্রের জাল। পশ্চিমবঙ্গেও ব্যাপকভাবে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান সীমান্তঘেঁষা হওয়ায় লাভ জিহাদের চক্র বেশ সক্রিয়।

এগুলি পুরো ভারতবর্ষের ইসলামীকরণের 'গজওয়া-ই হিন্দ'-এর কর্মসূচির একটি গভীর চক্রান্তের আওতায় চলছে। তবে এর গভীর শিকড় সব থেকে বেশি রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, রাজ্যজুড়ে প্রতি মাসে কমপক্ষে বেশ কয়েকটি মামলা পাওয়া যায় যেখানে হিন্দু মেয়েদের ভালোবাসা বা প্রেমে জড়িয়ে বিবাহ করে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয় এবং সন্তান জন্ম দেওয়ার পরে ছেলেটি আবার অন্য একটি বিবাহ করে। সূত্রে জানা যায়, এখানে মুসলমান যুবকরা তাদের নাম রাজু, রাহুল, সোনু, রাজ, সানি ইত্যাদি নাম নিয়ে,হাতে হিন্দুদের মতো তাগা পরে বিভিন্ন মন্দির এবং হিন্দু মহল্লায় ঘুরে বেড়ায় যাতে হিন্দু মেয়েরা তাদের প্রেমের ফাঁদে পা দেয়। সঙ্গে থাকে দামি উপহার। সিনেমার নায়কদের মতো ব্যয়বহুল হোটেলগুলিতে প্রবেশের কৌশলগুলি অমুসলমান মেয়েদের ফাঁদে ফেলার জন্য ব্যবহৃত হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অন্তর্জাতিক সহ-সভাপতি সুরেন্দ্র জৈন বলেছেন, 'লাভ জিহাদ' শব্দটি এই চক্রান্তকে ব্যাখ্যা করে। তিনি বলেছেন যে বাস্তবে সেখানে ভালোবাসা নেই, আছে শুধু জিহাদ। আসলে এটি ব্রিটেনে 'ইসলামিক সেক্স গ্যাং' নামে পরিচিত। এটির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো একদিকে হিন্দু মেয়েদের জড়িত করে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস করা এবং অন্যদিকে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা। হিন্দু মেয়েদের এই ফাঁদে পা দেওয়ার পর দুটি পরিণতি রয়েছে— তারা হয় পাশবিক জীবন গ্রহণ করে নতুবা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়।'

এটি কেবল ভারতে নয়, গোটা বিশ্বে চলছে। যারা এই কৌশলটি চালাচ্ছে বা বাস্তব রূপ দিচ্ছে তাদের প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করা হয়, যাতে তারা এই কাজটি ভালোভাবে চালিয়ে যেতে পারে। এ থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হলো হিন্দু সমাজকে তাদের ধর্ম সম্পর্কে সচেতন করা এবং মেয়েদের হিন্দুত্বের ধারণা

সম্পর্কে সচেতন করা। তিনি বলেছেন যে ইসলামে নারীদের জীবন নারকীয় এবং কেবল 'ব্যবহারের জিনিস' হিসেবে বিবেচিত হয়। লাভ জিহাদের শিকার হওয়ার পরে যদি কোনও হিন্দু মেয়ে দুর্ঘটনাক্রমে ধর্মান্তরিত হয়, তবে সে নারকীয় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

এরকমই একটি ইসলামিক সেক্সগ্যাঙের পাল্লায় পড়েছিল শ্রদ্ধা ওয়াকর। তাকে মেরে টুকরো টুকরো করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। দু'বছর আগে অর্থাৎ ২০২০ সালেই আফতাবের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করেছিলেন শ্রদ্ধা ওয়াকর। খুনের তদন্তে নেমে সেই অভিযোগপত্র হাতে পেয়েছে দিল্লি পুলিশ। জানা গেছে, ভাসাই থানায় এই অভিযোগ করেছিলেন শ্রদ্ধা। তারপর কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। দিল্লি পুলিশের একটি সূত্র বলছে, বছর দুয়েক আগে করা অভিযোগপত্রে শ্রদ্ধা তাঁর খুন হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে জানিয়েছিলেন যে, আফতাব তাঁকে ছ' মাস ধরে মারধর করছে। শুধু তাই-ই নয়, তাঁকে কেটে টুকরো করে ফেলারও হুমকি দিয়েছে।

দিল্লি পুলিশের দাবি, আফতাবের উগ্র আচরণ সম্পর্কেও শ্রদ্ধার বাবা-মা অবহিত ছিল। শুধু তাঁর পরিবারই নয়, মারধরে আহত হওয়ার একটি ছবি বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে কী কী ঘটনা ঘটেছে তারও উল্লেখ করেছিলেন শ্রদ্ধা। হোয়াটসঅ্যাপ ও ইনস্টাগ্রামে বন্ধুদের সঙ্গে কথোপকথনও পুলিশের হাতে এসেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

২০১৯ সালে একটি ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে পরিচয় হয় আফতাব-শ্রদ্ধার। ২০২০ সালে শ্রদ্ধার অভিযোগপত্রে মারধর, হুমকি, খুনের হুমকির উল্লেখ থাকলেও তখনও তাঁদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক ছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই আফতাব শ্রদ্ধাকে খুনের কথা স্বীকার করেছেন। যদিও শ্রদ্ধার দেহাংশ এবং কাটা মুণ্ডএখনও উদ্ধার

আফতাবকে জেরা শুরু করার পরই তাঁর পরিবারের 'উধাও' হয়ে যাওয়ায় সন্দেহ তৈরি হয়েছে পুলিশের মনে। আফতাবের কার্যকলাপের কথা আগে থেকেই জানত তাঁর পরিবার।

করতে পারেনি পুলিশ।

শ্রদ্ধা হত্যাকাণ্ড নিয়ে এবার সরব হয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। গুজরাটে ভোটপ্রচারে গিয়ে ফের একবার লাভ জিহাদের প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। তিনি বলেন, শ্রদ্ধা হত্যাকাণ্ডে আফতাব পুনাওয়ালার হিন্দু মহিলাদের সঙ্গে ডেট করার নেপথ্যে ছিল সংবেদনশীলতা। অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আফতাবরা সব শহরেই থাকতে পারে, যদি দেশে কড়া নেতা না থাকেন। সেই কারণেই ফের একবার নরেন্দ্র মোদীকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করে তোলা প্রয়োজন তৃতীয়বারের জন্য, ২০২৪ সালের ভোটে।'

হিমন্তর দাবি, লাভ জিহাদ রুখতে ইউনিয়ন সিভিল কোড প্রয়োজন। এদিকে, শ্রদ্ধা হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে মুখ খুলে হিমন্ত বলেন, 'কোনো এক পুলিশকর্মী আফতাবকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, কেন সে বেছে বেছে হিন্দু মেয়েদেরই ডেট করতেন? উত্তরে আফতাব বলেছিলেন, 'হিন্দুরা খুব আবেগপ্রবণ হয়।' দেখুন এটা শুধু একটি আফতাবের কাহিনি নয়। দেশে এমন বহু আফতাব আর শ্রদ্ধা রয়েছে। আর দেশের প্রয়োজন একটি কড়া আইন লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে।'

শ্রদ্ধাকে হত্যার ৬ মাস পরে ধরা পড়েছে অভিযুক্ত আফতাব। শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর পরিবারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় শ্রদ্ধার বাবা দ্বারস্থ হন পুলিশের। খোঁজ শুরু হয়। ততদিনে সোশ্যাল মিডিয়াতেও শ্রদ্ধার পোস্ট নেই। তদন্তে এগোতেই আফতাবের তথ্য উঠে আসে। অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়। জানা যায়, ১৮ মে শ্রদ্ধাকে হত্যা করে আফতাব। পরে শ্রদ্ধার দেহ ৩৫টি টুকরো করে ফ্রিজে রেখে, পরে দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় সে ছড়িয়ে দেয়। আফতাবকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আর তারপর থেকে উধাও তার বাড়ির লোক। আচমকাই বাড়ি ছেড়ে অজ্ঞাত কোনও জায়গায় গা ঢাকা দিয়েছেন আফতাবের পরিবারের সদস্যরা।

আফতাব দিল্লির ফ্ল্যাটে থাকত। পৈতৃক বাড়ি মহারাষ্ট্রের পালঘরে। দু'জায়গাতেই প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

সংবাদসংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, মানিকপুর পুলিশ আফতাবকে ভাসাইতে ডেকে প্রথমবার বয়ান রেকর্ড করার পর থেকেই উধাও তাঁর পরিবার। পরবর্তী সময়ে মানিকপুর পুলিশ একাধিকবার আফতাবের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও কোনও জবাব মেলেনি।

আফতাবকে জেরা শুরু করার পরই তাঁর পরিবারের 'উধাও' হয়ে যাওয়ায় সন্দেহ তৈরি হয়েছে পুলিশের মনেও। আফতাবের কার্যকলাপের কথা আগে থেকেই জানত তাঁর পরিবার। শ্রদ্ধাকে গত মে মাসেই খুন করেছে আফতাব, সে কথাও হয়তো জানত আফতাবের পরিবার। সেই কাজেই আফতাবকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই বাড়ি ছেড়েছেন তারা, এমনটাই অনুমান পুলিশের। □

রাষ্ট্রপিতা নন, রাষ্ট্রের সুসন্তান

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত উত্তর দিল্লিতে একটি মাদ্রাসা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ইসলামি ধর্মগুরুদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। একই সঙ্গে ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের আগ্রহ নিয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে একটি বৈঠকও করেন।

সরসঙ্ঘচালকজী তাঁদের আগ্রহে কোনোরকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব না রেখে প্রধান মৌলবি উমর আহমেদ সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে একটি মসজিদে গিয়ে তাঁর পিতার মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সেই কারণে তাঁদের অনুভব হয় সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত হলেন 'রাষ্ট্রপিতা'। কারণ তিনি রাষ্ট্রের সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি সমমনোভাব পোষণ করেন। সকলের প্রতি সমান সহানুভূতিশীল। সরসঙ্ঘচালক মোহনজীর সঙ্গে বৈঠকের পরে মৌলবি ইলিয়াসি সাহেব সংবাদ সংস্থাকে জানান, 'আমরা বিশ্বাস করি দেশ সবার আগে। আমাদের ডিএনএ এক। শুধু ভগবানকে ডাকার পদ্ধতিটা আলাদা।'

আজকে ইলিয়াসি সাহেব বা অন্যান্য মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ যে কথা বলছেন, তা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে বলে আসছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষকে সঙ্ঘ সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার বা অজ্ঞতাবশত ভুল বুঝিয়ে আসছেন। তাঁরা বলেন আরএসএস হিন্দু ধর্মীয় সংগঠন। এরা মুসলমান বিরোধী সংগঠন। এইরকম ভুল ব্যাখ্যা করেন। পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে যেমন পুকুরের গভীরতা মাপা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনি সঙ্ঘের বাইরে থেকে সঙ্ঘকে জানা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ হলো একটি জাতীয়তাবাদী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। এই সংগঠন সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণের কথা চিন্তা করে কাজ করে থাকে।

ভারতের অধিবাসী সবারই পূর্বপুরুষ হিন্দু। সেই কারণে এখানে বসবাসকারী সকলেই হিন্দু। সঙ্ঘ যখন হিন্দু সংহতির কথা বলে তখন সমস্ত ভারতীয়র সম্পর্কেই বলে। সঙ্ঘ কাউকে বাদ দিয়ে বলে না। মোহনজী একটি বৌদ্ধিকে বলেছিলেন, সাংবাদিকরা কেবলই জিজ্ঞাসা করেন, সঙ্ঘ কেন মুসলমানদের সভ্য হতে দেয় না? কেন শুধুমাত্র হিন্দুরাই সঙ্ঘের সভ্য হতে পারে? তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, হ্যাঁ, আমরা কেবলমাত্র হিন্দুদেরই গ্রহণ করি। আমরা সব ভারতীয়কেই 'হিন্দু' মনে করি। আলাদাভাবে আমাদের কাছে ব্রাহ্মণ, হরিজন, শৈব, বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিস্টান— এইসবের কোনো স্থান বা অস্তিত্ব নেই। সেই হিসেবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্ঘের বিষয়ে ধারণা হয়েছে সঙ্ঘ কোনো ধর্মের বিরোধী নয়। যে কোনো রাষ্ট্রবিরোধী কাজের সর্বদা বিরোধী। সেই কাজে যে সম্প্রদায়ের মানুষই যুক্ত থাকুন না কেন, তার যথাযথ শাস্তির দাবি করে সঙ্ঘ। এজন্যই মনে হয় ইলিয়াসি সাহেবের ধারণা হয়েছে মোহনরাও ভাগবত যেহেতু সমগ্র রাষ্ট্রের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেন তাই তিনি রাষ্ট্রপিতা। বস্তুত তাঁর এই ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। ভাগবতজী ভারতরাষ্ট্রের একজন সুসন্তান মাত্র।

এই রাষ্ট্র ভাগবতজীর জন্মের হাজার হাজার বছর আগে থেকে বিদ্যমান। ইলিয়াসি সাহেবের প্রতি সম্মান জানিয়ে বলা যায় কোনো নেতা রাষ্ট্রপিতা হতে পারেন না। তাঁর এই ধারণাটি একেবারে ভুল।

—তারাশংকর চক্রবর্তী,
আরামবাগ, হুগলী।

তাঁবেদারির পথে নির্ভীক সংবাদপত্র

একটি দৈনিকের দুটি সংবাদে আমার চোখ আটকে গেল। যদিও তার প্রথম পৃষ্ঠায় আছে, 'মোদীর নোট বাতিলের দেড় বছর আগে নয়া ৫০০ টাকা ছাপা শুরু।' আবার প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদাম্বরমের 'গুজরাট কোনও অনুসরণযোগ্য মডেল নয়।' রোজের মতো এই সংবাদগুলিও মন দিয়ে যথারীতি পড়লাম। দীর্ঘদিন অন্যান্য সংবাদপত্রের সঙ্গে এই দৈনিকটিও পড়ছি। এই কাগজটি প্রকাশনার প্রথম দিন থেকেই আমি এর গুণমুগ্ধ পাঠক। ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থার পুরো সময়টাই সম্পাদকমশাই জেলবন্দি ছিলেন। এই রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় বারবার তাঁর কাছে জরুরি অবস্থার গুণগান করে তাকে পত্র লিখতে লোক পাঠিয়ে ব্যর্থ হন। সেই কারণে তাঁকে জরুরি অবস্থার পুরো মেয়াদটাই জেলবন্দি থাকতে হয়। বলা ভালো, তিনি অন্যায়ের সমর্থক না হয়ে জেলে থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলেন। তাই রাজ্যের আপামর মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা তিনি সহজেই অর্জন করেছিলেন। সেই জন্যই তার প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রকে কোনোদিন হোঁচট খেতে হয়নি। তাই তারা যখন লিখেছিলেন, 'ভগবান ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।' সেদিন বাঙ্গলার মানুষ তা যথার্থ বলে মনে করেছিলেন।

শুরুতেই আজকের দুটি সংবাদের কথা বলেছি। এবার সেই প্রসঙ্গে আসা যাক।

(১) শরতে রূপসী ভূস্বর্গের টানে পর্যটকের ঢল। পরের খবরটি খুব ছোটো করে ৬ এর পাতায় আছে।

(২) ঢাকার আদালত থেকে অভিজিৎ খুনে দুই ফাঁসির আসামিকে ছিনতাই। যে দৈনিক বিজেপি বা মোদী সরকারের কোনো ভালো কাজকে তুলে না ধরে শুধু মাত্র খারাপ খবরগুলি প্রকাশ করে 'মোগাম্বোকে' খুশি করার চেষ্টা করে, সেই তারা এই জাতীয় সংবাদ প্রকাশ করে ওই 'মোগাম্বোর' বিরাগ ভাজন হবে না তো? হয়তো তাদের হাতে থাকা সরকারি বিজ্ঞাপন ঠিকঠাক পাবে না। এই চালেই তো ওই মোগাম্বোর দল সংবাদপত্রগুলোকে তাদের অনুগত দাসে পরিণত করেছে। সেই জন্যই রাজ্যের দুর্নীতির খবর এদের সংবাদপত্রে চোখে পড়ে না। শুধুমাত্র আদালতের যে সংবাদ প্রতিদিন

ফঃ ৩

প্রকাশিত হয় তা থেকেই রাজ্যের পাঠককুল রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের দুর্নীতির খবর জানতে পারে।

এতো দিন বিজেপি বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে এই বিজ্ঞাপন লোভী সংবাদপত্রগুলি একযোগে বলে এসেছে কাশ্মীর থেকে ৩৫৬ ধারা তুলে নেওয়ায় কাশ্মীরের আইন শৃঙ্খলার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রে তার উলটোটাই হয়েছে। তারা এবার কী বলবে? কোনো উত্তর আছে কি? অপরাধী যতই চালাক হোক না কেন সে সবটা লুকিয়ে রাখতে পারে না। কোনো না কোনো প্রমাণ সে ফেলেই রাখে। দুঁদে গোয়েন্দারা তাদের শেষ পর্যন্ত ধরেই ফেলেন। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। সত্যকে চিরদিন চাপা দিয়ে রাখা যায় না। একদিন তা প্রকাশ পাবেই। তাদের সংবাদে 'শরতে রূপসী ভূস্বর্গের টানে পর্যটকের ঢল' সংবাদের ঠিক উপরেই আছে 'অনন্তনাগে সঙ্গীদের গুলিতে মৃত্যু জঙ্গীর, শ্রীনগরে ধৃত আরও তিন'। এর পরেও আর কাশ্মীরের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কথা বলার কোনো মুখ কি আর বিরোধীদের থাকে? এটা কি মোদী সরকারের সুশাসনের পরিচয় নয়?

মোদী সরকারকে খারাপ প্রতিপন্ন করার জন্য এরাই এক রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের তুলনা করে। আবার এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের তুলনা টানে। কিছুদিন আগেই আমাদের দেশের আর্থিক উন্নয়নের হার শ্রীলঙ্কার থেকেও খারাপ এরাই বলেছিল। পরে শ্রীলঙ্কা একটি দেউলিয়া দেশ হিসেবে পরিচিত হয়। ওখানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ভারত প্রতিবেশী দেশের বিপদে চুপ থাকতে পারেনি। ভারত থেকে খাদ্য ও পেট্রল সরবরাহ করে ওদেশের মানুষের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়। শ্রীলঙ্কার বর্তমান সরকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। ওরা যখন নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের তুলনা টানে আজ তাহলে বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা টানতেই হবে।

বাংলাদেশে জঙ্গিদের এতটাই বাড়বাড়ন্ত যে তারা ফাঁসির খুনি আসামিকে সহজেই ছিনতাই করতে পারে। আমাদের দেশে তা কখনই সম্ভব নয়। এটাই মোদী সরকারের কৃতিত্ব। এর পরেও কি বর্তমান মোদী সরকারের বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচার চালানো খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

—শ্যামল কুমার হাতি,
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

কেন ভুলে যাচ্ছি আমাদের ইতিহাস?

ইতিহাসে বর্ণিত 'পলাশী যুদ্ধ কেবল মুসলমানদের পরাজয়', সেদিন কিন্তু আমাদের আনন্দের দিন ছিল। খুব সংক্ষেপে বলা যায়, এখনকার সরকার পোষিত বুদ্ধিজীবীদের মতো তখনকার ঐতিহাসিকরা ভয়ে কিংবা ভক্তিতে রচনা করেছেন বিকৃত ইতিহাস। তাই তারা পলাশী যুদ্ধের কলঙ্ক নিয়ে গৌরবের কালিমা লিপ্ত করেছেন সিরাজউদ্দৌলাকে হিরো বানিয়ে। ঠিক যেন সুগার কোটিং পিলের মতো। এতে ইতিহাসের সঠিক বিচার হয়নি। আমরা রমেশ চন্দ্র মজুমদার, রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস বাদ দিয়ে কেবল রোমিলা থাপ্পার, রাম চন্দ্র গুহর বিকৃত ইতিহাস আজও পড়ে চলেছি। প্রকৃত ইতিহাস জানতে দিল কই? একদিকে নবাব বাহিনী, ২৪ বছরের উচ্ছৃঙ্খল, বহুগামী, নারী বিলাসী সিরাজউদ্দৌলাও ৬৪ বছর বয়স্ক মিরজাফর এবং তাদের সেনাবাহিনী, অন্যদিকে ৩৪ বছরের চতুর ক্লাইভ এবং তার দলবল। ওই যুদ্ধের আগে যুদ্ধের হার-জিত ঠিক হয়েছিল। যুদ্ধের পর ভেঁপু বাজিয়ে সোনার বাঙ্গলার ধনরত্ন লুঠ করে জাহাজ চলেছে লন্ডনের দিকে, তখন মিরজাফর আর তার বেটা মীরন দুজনে মিলে সিরাজের হারেমের ২৫৬ বা তার বেশি মহিলাকে নিয়ে ভাগবাঁটওয়ারা করতে ব্যস্ত থাকে। এটাই ছিল সেদিনের প্রকৃত ইতিহাস। দুশ্চরিত্র, লম্পট, শোষণকারী, ধর্মীয় বিদ্বেষকারী মহাশয়তান ছিলেন সিরাজ। সবাইকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সিরাজ চরিত্র পড়ার জন্যে অনুরোধ করবো।

এক মরু হানাদারের পরিবর্তে আর এক দল পশ্চিমি তস্করদের মধ্যে তফাত কী আছে? লুণ্ঠন, শোষণ, অত্যাচার ছাড়া আর কী আছে? এক খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সময়ের দূরত্ব ছাড়া যেমন গুরুত্বহীন, ঠিক তেমনি কালের পথ ধরে ওই দুই বর্বরোচিত শাসকদের মধ্যে পার্থক্য খোঁজা কেবল অর্থহীন। ভালো-মন্দের মতো শত্রুর কোন তফাত থাকে? তারা দুজনই আমাদের শত্রু। কেউ বন্ধু, কেউ শত্রু এমন কখনোই নয়।

একবার ভাবুন, যদি ইংরেজরা এদেশে না আসত, যদি ইংরেজদের পরিবর্তে ইসলামিরাজ এখনও কায়েম থাকত, আজকের ভারতবর্ষ কেমন হতো? 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস'-এর মতো গা বমি করা সেই ঘৃণ্য, ভয়ংকর পুনরাবৃত্তির দৃশ্য কখনো কল্পনা করেছেন? আমরা শুধু ইংরেজদের অত্যাচার, শোষণের কথা মনে রেখে তাদের উপর ঘৃণার ভাব পোষণ করি। কিন্তু মুসলমানদের আরও বেশি শোষণ, অত্যাচার, ধর্মান্তরকরণ কেমন করে ভুলে যাই? ইংরেজরা শত্রু আর মুসলমানরা বন্ধু কেমন করে হয়? ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন, বৃহস্পতিবার পরাধীনতার সূর্যাস্ত ছিল না, ছিল হিন্দুদের মুক্তির সূর্যোদয়। ঈশ্বরের অশেষ কৃপা বলা যায়। এখনকার প্রগতিবাদী, সেকুলারপন্থী, বিপ্লবী, অতিবিপ্লবী, বুদ্ধিজীবীদের ভাষা সেদিন ভয়ে জুজু হয়েছিল। তাই তাদের সচল লেখনী অচল করে কেমন মৌন ছিল? আজ তারা কেউ বিপ্লবী, অতিবিপ্লবী, কেউ সেকুলারপন্থী, কেউ-বা হবেন তথাকথিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী। তাদের রঙ্গ তামাশা দেখে হাসি পায়। অতীত ভুলে অতীতের ঐতিহ্যকে হানাদারদের মতো তারাও আক্রমণ করতে পিছুপা হন না। এখন সঠিক সময়, অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার। ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়। বারবার কখনো যায় না।

কিন্তু ভারতে হিন্দুরা বাঁচলেও বাঙ্গালি হিন্দুদের কী হবে? বাঙ্গালি হিন্দুরা মূর্খ কালিদাসের মতো করুণ। প্রগতিশীল হতে গিয়ে তারা আজ দেশছাড়া, ভাষাহারা, দিশাহারা। এটাই কি বাঙ্গালির ভবিতব্য? এর শেষ কোথায় ভাবতে হবে।

—সুবল সরদার,
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

নারী সচেতন হলে শক্তিশালী হবে

সুতপা বসাক ভড়

দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়, ঘটে যায় নানান ঘটনা। এরই মধ্যে সমাজে, দেশে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার জন্য আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠি, আবার কিছু ঘটনার জন্য হয়ে পড়ি বিমর্ষ। ওই সকল দুঃখজনক ঘটনার কোনো সান্ত্বনা পাওয়া যায় না। আচ্ছা আমরা কি কখনও আত্মবিশ্লেষণ করেছি? যেকোনও সামাজিক অপরাধের জন্য আমরাও যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দায়ী, তা কি স্বীকার করেছি? হ্যাঁ শ্রদ্ধা-আফতাবের ঘটনা— হঠাৎ করে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে পড়া একটি খবর মাত্র। যেমন হিমবাহ। বেশিরভাগ অংশ থাকে জলের নীচে, ওপর থেকে ধারণাও করা যায় না যে কী সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে পারে ওই হিমবাহের কাছে পৌঁছালে। তাতে বহু জাহাজ চিরতরে বিনষ্ট হয়ে গেছে, প্রাণহানি হয়েছে প্রচুর। তবে, আমরা এর থেকে শিক্ষা নিয়েছি, সাবধান হয়েছি। ফলস্বরূপ, দুর্ঘটনার সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে।

প্রকৃতির থেকে আমরা কি কিছুই শিখতে পারি না, নাকি শামাপোকার মতো ছুটে যেতে হবে আগুনের দিকে? নিজেকে, নিজের পরিবার, সমাজ ও দেশকে শেষ করে দেওয়ার জন্য? লাভ জিহাদের প্রশ্ন উঠলেই ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দেওয়া হয়। আচ্ছা এর বিপরীত ঘটনা কতগুলো ঘটেছে? এবং সেই পরিবার কি সামাজিক দায়িত্ব সুসম্পন্ন করেছে? নাটক, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয় মুসলমান ছেলেটি খুব ভালো প্রেমিক। আর আমাদের ঘরের কিছু মেয়ে বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কর্মক্ষেত্রে ওইরকম প্রেমিকের প্রেমে পরার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। চলচ্চিত্রের ঘটনাবলী নিজেদের জীবনে উৎকীর্ণ করার জন্য ওইসব মেয়ে মোহের বশে লাভজিহাদের ফাঁদে পড়ে যায়। লাভ-জিহাদের শিকার যে মেয়েরা হয়েছে, তাদের মধ্যে কয়েকটা নাম মাত্র প্রকাশ্যে এসেছে—শ্রদ্ধা ওয়াকার, তারা সচদেব, আখিলা ইত্যাদি। বাকি আশি শতাংশেরও বেশি অত্যাচারিতা, ধর্ষিতা হয়ে খুন হয়েছে কিংবা নরকোত্তর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছে।

আমাদের সঙ্গে ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের কোনও তুলনাই হয় না। শিক্ষার নামে, প্রেমের আড়ালে যুবকরা ফাঁদ পেতে থাকে। অন্ধকারময় জীবন, হিজাব, বোরখার আড়ালে লুকিয়ে থাকে তাদের মেয়েদের অশ্রু। সংগীত, শিল্প, ব্যক্তি স্বাধীনতায় নিষেধাজ্ঞা। স্বামীর আরও তিনজন পর্যন্ত স্ত্রী থাকা শরিয়ত সাপেক্ষ। এছাড়া নিকটাত্মীয়ার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক সেখানে বৈধ। যা হিন্দু সংস্কৃতিতে চিন্তাতীত। খ্যাদ্যাখাদ্যের কোনও শুদ্ধতা নেই। একই থালা থেকে অনেকে খেতে থাকে। সর্বক্ষেত্রে অন্যের ধর্মনাশ এদের একমাত্র প্রবণতা। সেই পরিবেশে হিন্দুধর্মের একটি মেয়ের জীবনযাপন করা দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। অথবা নিজ কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলেও তার নিজধর্মে ফিরে যাওয়ার সব পথ বন্ধ করে দেয় ওই দুর্বৃত্ত প্রকৃতির লোকজন।

চিত্রটি ইদানীং আমাদের দেশের অনেক জায়গায় দেখা যাচ্ছে। তবে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, কর্ণাটকের মতো রাজ্যে লাভজিহাদের ঘটনা অপেক্ষাকৃত বেশি। এইসব রাজ্যে তথাকথিত সেকুলারবাদী বুদ্ধিজীবীদের বাস। তাঁরা অনেক জেনে, বুঝে নিজেদের স্বাভিমান বিসর্জন দিয়ে ফেলেছেন। অথচ রাজস্থান, পঞ্জাবের মতো রাজ্য যেখানে ইসলামের আক্রমণ সবচেয়ে বেশি হয়েছে, সেখানে এই ধরনের ঘটনা অনেক কম ঘটে থাকে। এই রাজ্যগুলি পরিচিত তপোভূমি, বীরভূমি রূপে। সেখানকার মানুষ নিজের ভূমির প্রতি, স্বাভিমানের প্রতি দায়বদ্ধ। কেবলমাত্র এই স্ব-বোধকে জাগ্রত করার প্রয়োজন। তাহলে আর কাউকে পথভ্রষ্ট হতে হবে না। সন্তানদের মধ্যে তা জাগ্রত করার দায়িত্ব মায়েদের। ছোটোবেলা থেকে সঠিক পথ দেখিয়ে, নতুন প্রজন্মকে নিজ সংস্কৃতিতে জারিত করে মাতৃশক্তি। এই শক্তি অপরাজেয়। এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার পত্রাবলী থেকে উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক — 'বর্তমান ভারতের ভিত্তি হলো আধ্যাত্মিকতা, পবিত্রতা, ত্যাগ; তার সবটুকুই এসেছে নারীজাতির প্রভাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে শক্তি, স্বাধীনতা ও মানবিকতার মতো অন্যান্য ভাব, যা এ যুগের কাছ থেকে বিশ্বের মহান উত্তরাধিকার, সেইসব ভাবগ্রহণের এরাই যোগ্য পাত্র।

....অন্তরের বিকাশ ছাড়া ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ উপহাসে পরিণত হয়। যারা বিচ্যুত হয়েছে জাতীয়তাবোধের আদর্শ থেকে তাদের উদ্বুদ্ধ করতে পারবে না কোনোপ্রকার প্রেরণা। হিন্দু নারীকে প্রচণ্ডভাবে কাজে লাগাতে হবে নিজের সংহত শক্তিকে। কেবল তখনই সে উদার শিক্ষানীতি দ্বারা লাভবান হতে পারবে। যা তার আত্মিক বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন। হিন্দু নারী এই দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ সক্ষম' (প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণার অনূদিত 'অসামান্য পত্রলেখিকা নিবেদিতা'-র কুড়ি নম্বর পত্র,পৃষ্ঠা-৮৭, ৮৮, প্রকাশকঃ-শ্রী সারদা মঠ)। সুতরাং লাভজেহাদের মতো মরণফাঁদ থেকে হিন্দু কন্যাদের বাঁচাতে হিন্দু মায়েদের সচেতন হতেই হবে। ▯

কনজাংটিভাইটিস হলে কী করবেন

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

কনজাংটিভাইটিস চোখের একটি রোগ। জীবাণু সংক্রমণ, আঘাত লাগা কিংবা অ্যালার্জি থেকে হতে পারে। একে-একে দুটি চোখই আক্রান্ত হয়। সাধারণত ভাইরাসঘটিত সংক্রমণের জন্য অনেকেরই দুই চোখ লাল হয়ে পড়ে, কর কর করে। একেই কনজাংটিভাইটিস বলা হয়। গ্রামবাঙ্গলায় রোগটিকে বলা হয় 'জয় বাংলা' বা চোখ ওঠা। রোগটি মারাত্মক ছোঁয়াচে, তাই বাড়িতে কারও এই রোগ হলে সাবধানে থাকতে হবে বাকিদেরও। সহজেই নিরাময়যোগ্য এই রোগ। কর্নিয়া আক্রান্ত হলে সারতে সময় লাগতে পারে। সমস্যার শুরুতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। আর ছোটোদের তো এমনিতেই সহ্য ক্ষমতা কম, তাই তাদের চোখের যত্ন নিতে হবে। চোখ দিয়ে জল পড়া, চুলকানোর মতো সমস্যা বুঝলেই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন।

কেন হয় ঃ চোখের মণির ওপর এবং চোখের পাতার ভেতরে লাইনিংকে বলা হয় কনজাংভিটা। এটি খুব তাড়াতাড়ি জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হয়। সংক্রমণ নানা কারণে হতে পারে। যেকোনো আবাঞ্ছিত বস্তু, রাসায়নিক যদি চোখের ভেতরে চলে যায় তাহলে সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। চোখে ঠাণ্ডা লেগেও হতে পারে। এর থেকেই হয় অ্যালার্জিক কনজাংটিভাইটিস।

লক্ষণ ঃ (১) হঠাৎ চোখের সাদা অংশ ফুলে যায়। (২) চোখের পাতা ফুলে যায়। (৩) আঠালো রস বের হয়। (৪) আলোতে চোখ খুলতে কষ্ট হয়। (৫) ঘিয়ে রঙের ঘন পর্দা দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে। (৬) চোখ লাল হয়ে জল পড়তে পারে। (৭) চুলকাতে পারে বা জ্বালা করতে পারে। (৮) ঘুম থেকে ওঠার পর চোখের পাতা আটকে যায়। (৯) ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হতে পারে। সঙ্গে সর্দি, হাঁচিও হয় অনেক সময়।

কী করবেন ঃ (১) পরিষ্কার জলে চোখ ধুতে হবে। (২) রোগীর ব্যবহার করা জিনিস অন্য কারও ব্যবহার করা নিষেধ। (৩) চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনো ওষুধ লাগানো চলবে না। (৪) রোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। (৫) কালো চশমা বা সানগ্লাস ব্যবহার করতে হবে। (৬) কনজাংটিভাইটিস জীবাণু সংক্রমণের জন্য হয়। সঠিক চিকিৎসায় সহজে সেরে যায় কিন্তু সামান্য অবহেলায় চিরদিনের মতো চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যেতে পারে। (৭) সংক্রমণ কনজাংটিভাইটিস জীবাণু থেকে হলে চিকিৎসকের পরামর্শ মতো চোখ বার বার ধুতে হবে। (৮) অ্যালার্জি থেকে হলে খাওয়াদাওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ থাকে। যেধরনের খাদ্যে অ্যালার্জির সম্ভাবনা তা কিছুদিন বন্ধ রাখতে হবে। (৯) সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য চিকিৎসক আই ড্রপ, অ্যাস্ট্রিনজেন্ট আই ড্রপ বা অয়েন্টমেন্ট দিতে পারেন। (১০) এমনকী সেরে যাওয়ার পরও বেশ কিছুদিন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হতে পারে।

সদ্যোজাত শিশুর কনজাংটিভাইটিস ঃ

মাতৃগর্ভ থেকেই সংক্রমণের জন্য কনজাংভাইটিস হতে পারে। একে বলা হয় নিয়োন্যাটাল কনজাংভাইটিস বা পিংক আই। ইনফেকশন, ইরিটেশন অথবা চোখের জল না বেরিয়ে জমে থাকার মতো নানা কারণেই এই সমস্যা হতে পারে। এমনকী মায়ের থেকেও শিশুর সংক্রমণ হতে পারে। সদ্যোজাত শিশুর ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি ভয়াবহ।

লক্ষণ ঃ (১) জন্মের ১দিন থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যেই কনজাংটিভাইটিসের নানা লক্ষণ দেখা দিতে পারে। (২) চোখ লাল। (৩) চোখের পাতা ফোলা ফোলা। (৩) পুঁজ জড়ানো চোখ।

কী করবেন ঃ (১) পরিষ্কার জলে চোখ ধুয়ে দিতে হবে। (২) চোখ জুড়ে গেলে উষ্ণ জলে তুলো ভিজিয়ে দিনে বেশ কয়েকবার চোখ পরিষ্কার করাতে হবে। মনে রাখতে হবে, পরিচ্ছন্ন না হলে ভুগতে হবে। তাই প্রতিবার চোখে হাত দেওয়ার আগে হাত ভালো করে ধুয়ে নিতে ভুলবেন না।

সতর্কতা ঃ শিশুর চোখে সামান্য সমস্যা হয়েছে বুঝতে পারলেই একটুও দেরি না করে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। কারণ ছেটো শিশুরা তাদের সমস্যার কথা বলতে পারে না। চিকিৎসা চললেও তিন-চার দিনের মধ্যে সারে না। চোখের চারপাশ লাল হয়ে ফুলে থাকে, ব্যথাও থাকে, দেখতে অসুবিধা হয়। তাই সেরে যাওয়া পরেও বেশ কিছুদিন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ লক্ষণ ও মায়াজম মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যায়। এই রোগে প্রতিরোধের জন্য দেওয়া হয় অ্যান্টিবায়েটিক আই ড্রপ, অয়েন্টমেন্ট, ইন্ট্রাভেনাস অ্যান্টিবায়েটিক, ওরাল অ্যান্টিবায়েটিক। □

ইন্টার-কমিউনিটি অপরাধ বিচারে পৃথক ফৌজদারি আইন আবশ্যক

শ্রদ্ধা-হত্যার ঘটনা দিশা নির্দেশ করছে যে ইন্টার-কমিউনিটি (আন্তঃসম্প্রদায়) অপরাধের বিচারে দেশের ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর কোডে ভিন্ন ধারা এবং ভিন্ন বিচারপ্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে।

দেবযানী ভট্টাচার্য্য

শ্রদ্ধা ওয়াকর ও আফতাব আমিন পুনাওয়ালার লিভ ইন জীবন ছিল সংঘর্ষময়। বন্ধু, অফিস কলিগ তথা প্রতিবেশী প্রত্যেকেই জানিয়েছেন প্রবল কলহে জড়িয়ে পড়ত শ্রদ্ধা ও আফতাব। মা বাবার আপত্তির পরোয়া না করেই লিভ ইন করতে শুরু করেছিল শ্রদ্ধা ওয়াকর, কারণ দেহজ প্রেম শারীরিক নৈকট্যের প্রত্যাশী। ২০১৮'য় সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার পর ২০১৯-এ মুম্বইয়ের বাড়ি ছেড়ে মেয়ে ভাসাইতে লিভ ইন করতে চলে যাওয়ার পর সেবছরই শ্রদ্ধার মা-বাবা গিয়েছিলেন আফতাবদের বাড়িতে, মেয়ের সঙ্গে আফতাবের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। মুসলমান ছেলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি মানতে না পারলেও এবং মেয়েকে সে বিষয়ে নিষেধ করলেও মেয়ের মঙ্গলচিন্তায় শ্রদ্ধার মা-বাবা গিয়েছিলেন সেখানে। খবরে প্রকাশ, তাঁদের খুবই অপমানিত হতে হয় আফতাবদের বাড়িতে এবং আফতাবের এক তুতোভাই নাকি তাঁদের একপ্রকার তাড়িয়েই দেয় সেখান থেকে। চরম সেই অপমানের যন্ত্রণাতেই কিনা জানা নেই, শ্রদ্ধার মা হর্ষিলা ওয়াকর মারা যান তার ছ'মাসের মধ্যে।

অতঃপর, ২০২০ সালে, আফতাবের হাতে শারীরিকভাবে নিগৃহীত হয়ে তিনদিনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় শ্রদ্ধাকে। এই বছর নভেম্বর মাসেই আফতাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে ভাসাই পুলিশের কাছে এক জেনারেল ডায়েরি করে সে, যাতে লেখা হয় যে আফতাব তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছে। ২০২১ সালের এক রাত্রি শ্রদ্ধা কাটায় বন্ধুদের সঙ্গে, কারণ সে ভয় পেয়েছিল যে আফতাবের সঙ্গে থাকলে সেই রাতেই তাকে মেরে ফেলবে আফতাব আমিন পুনাওয়ালা। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শ্রদ্ধা ওয়ালকার ফোন করেছিল সাইকায়াট্রিস্ট ড. প্রণব কাবরাকে অবসাদ, উত্তেজনা, রাগ ইত্যাদির উপশমের চিকিৎসা সন্ধানে। সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যেতে চেয়েও পারেনি শ্রদ্ধা ওয়ালকার, এমনই মত শ্রদ্ধার বন্ধুদের এবং এইটিই প্রথম প্রশ্ন যে শারীরিক নির্যাতন ও ভয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করে কেন বেরিয়ে যেতে পারল না আধুনিক ও প্রগতিশীল এই মেয়ে? উত্তর অনুসন্ধানের কাজ পুলিশের।

শ্রদ্ধা কি বুঝতে পেরেছিল যে সম্পর্ক থেকে

বেরিয়ে এলেও আফতাবের হাত থেকে মুক্তি হবে না তার? আফতাব পুলিশকে জানিয়েছে শ্রদ্ধার সন্দেহবাতিকের কথা। নানা জায়গায় ফোনে কথা বলত আফতাব, আর তাই নিয়েই নাকি প্রবল অশান্তি করত এবং সেই অশান্তিরই চরম পরিণতি এই নৃশংস হত্যা। কিন্তু এই অভিযোগ যদি সত্যি হয় তবে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্পর্ক আফতাবই- বা ছিন্ন করল না কেন? আফতাব পুলিশকে জানিয়েছে হত্যার দিন গাঁজা সেবন করেছিল সে এবং সেই কারণেই নাকি নেশাচ্ছন্ন অবস্থায় মেরে ফেলেছে শ্রদ্ধাকে। অথচ এই আফতাবই পুলিশকে এও বলেছে যে শ্রদ্ধাকে হত্যার পরিকল্পনা সে করেছিল ক্রাইম থ্রিলার দেখে। প্রশ্ন রয়েই যায়, পরিকল্পনা করে হত্যা করা কি অনিবার্য ছিল? সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সহজতর পথটি নারী পুরুষ উভয়ের কাছেই ব্রাত্য হলো কেন?

শ্রদ্ধা কি এমন কিছু জানত যা বাইরের কেউ জানুক তা আফতাব চায়নি? সেই জন্যই কি সম্পর্ক ছিন্ন করতে চেয়েও শ্রদ্ধা পারেনি? কারণ জীবন্ত অবস্থায় সম্পর্ক থেকে শ্রদ্ধাকে বেরিয়ে যেতে দেওয়া আফতাবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কী এমন গোপন কথা থাকতে পারে আফতাবের যা শ্রদ্ধা জেনে ফেলেছিল? হত্যার দিন রাত্রে ড্রাগ নেওয়া আফতাব পুনাওয়ালা কি নিজেও জড়িত ছিল ড্রাগপাচার অথবা অন্য কোনো প্রকার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে? সেই সংক্রান্ত বিষয়েই ফোনে কথা বলতে হতো তাকে আর তাই নিয়েই উদ্দাম অশান্তি করত শ্রদ্ধা ওয়ালকার? শোনা গিয়েছে পেশায় শেফ আফতাব আমিন পুনাওয়ালার জীবনযাত্রার মান নাকি এমন ছিল, কেবলমাত্র শেফের চাকরি করে যা অর্জন করতে পারা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাহলে অন্য কী উপায়ে আয় করত আফতাব? সিক্রেট জানত বলেই মরতে হলো শ্রদ্ধা ওয়াকরকে? সেই জন্যই নিপীড়ন সহ্য করেও সম্পর্কে থেকে যেতে বাধ্য হতে হয়েছিল তাকে এবং সেই জন্যই অবসাদ, উত্তেজনা ও ক্রোধের উপশমের জন্য শরণাপন্ন হতে চেয়েছিল সাইকায়াট্রিস্ট প্রণব কাবরার?

২০২০ সালের ২৮ নভেম্বর ভাসাই পুলিশকে যে অভিযোগপত্র শ্রদ্ধা লিখেছিল সেটি নিম্নরূপ :

"To
The Police
Evershine City (Vasai CE)

I, Miss Shraddha Vikas Walker, age 25, would like to report Aaftab Amin Poonawala, age 26. Ph No.-7972771549, 8177883275 who currently lives at B-302, Regal Apartment, Vijay Vihar Complex near ARC Bhavan, has been abusing me and been beating me up. Today he tried to kill me by suffocating me and he scares and blackmails me that he will kill me cut me up in pieces and throw me away. It's been 6 months he has been hitting me but I did not have the guts to go to the police because he would threaten to kill me. His parents are aware that he beats me and that he tried to kill me. They also know about we living together in east and they visit on weekends. I lived with him till date as we were supposed to get married anytime soon and had the blessings of his family. Henceforth I am not willing to live with him so any kind of physical damage should be considered coming from him as he has been blackmailling me to kill me of hurt me whenever he sees me anywhere." অভিযোগ পত্রের ছত্রে ছত্রে শ্রদ্ধা লিখেছে যে আফতাব তাকে মেরে ফেলবে এবং সে আফতাবের সঙ্গে লিভ ইন করছিল এই আশায় যে আফতাব তাকে বিয়ে করবে। এ হেন পত্র থেকে এমন মনে হওয়াও অসম্ভব নয় যে পুলিশের কাছে জেনারেল ডায়েরি করার পিছনে শ্রদ্ধার আদতে উদ্দেশ্য ছিল আফতাবের ওপর তাকে বিয়ে করার জন্য চাপ সৃষ্টি করা এবং পরোক্ষে আফতাবের অত্যাচারী আচরণের দায় আফতাবের মা-বাবার ওপরেও চাপিয়ে দেওয়া যাতে আফতাবকে আরও বেশি করে চাপে রাখা যায়। শ্রদ্ধা আদতে পুলিশের ভয় দেখিয়ে আফতাবকে তার ওপর অত্যাচার করা থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছিল? শ্রদ্ধা ওয়ালকার যদি প্রকৃতই বিষিয়ে ওঠা সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইত তাহলে প্রাণের ভয় থাকার কারণে জেনারেল ডায়েরিতে পুলিশের কাছ থেকে সেই মর্মে সুরক্ষা প্রার্থনা করত। কিন্তু সেরকম কিছু সে করেনি।

অর্থাৎ আফতাবের সঙ্গে ব্রেক আপ করার প্রকৃত ইচ্ছা শ্রদ্ধার ছিল বলে মনে হয় না। হিংস্র, নির্যাতনকারী প্রেমিক, যে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিয়ে করেনি, তার সঙ্গে ব্রেক আপ করতে কেন চাইল না শ্রদ্ধা ওয়ালকার? ধরে নেওয়া যাক, ভালোবাসার ওপর কোনো এক ক্ষীণ বিশ্বাসের কারণে। হয়তো ভেবেছিল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে'। আবার এমন হওয়াও কি অসম্ভব যে আফতাবের বেআইনি উপার্জনের উৎস জেনে ফেলায় শ্রদ্ধাই বরং ব্ল্যাকমেইল করত আফতাবকে এবং চাপ সৃষ্টি করে নিয়ন্ত্রণ করতে

MAGE : REPUBLICWORLD

চাইত আফতাবের ব্যক্তিগত জীবন? শ্রদ্ধা হয়তো ছিল স্বাধীনচেতা প্রকৃতির সেই প্রগতিশীল মেয়ে যে তার পুরুষকে হাতের মুঠোয় রাখতে চাইত, কিন্তু নিজের হিন্দু চিন্তনের মধ্য দিয়ে হিন্দুর জীবনদর্শন, মানসিকতা ও নীতিবোধের সঙ্গে মুসলমানের জীবনদর্শন, মানসিকতা ও নীতিবোধের পার্থক্য ধরতে পারেনি এবং তারই চরম মাশুল গুনতে হয়েছে তাকে।

আফতাবের চোখের দৃষ্টিতে উগ্র যৌনতার ইঙ্গিত অসাবধানী মেয়েদের চুম্বকের মতো আকর্ষণ করার ক্ষমতা রাখে। এ সমাজের বহু মেয়েই আজও দেহসৌষ্ঠব ও শারীরিক সৌন্দর্যকে নিজের অন্যতম সম্পদ মনে করেন। সে সৌন্দর্যের বিশ্বাসযোগ্য প্রশংসা অনেক মেয়েকেই ইমোশনাল মেল্টিং পয়েন্টে নিয়ে চলে যেতে পারে। উপরন্তু, কোনো পুরুষ যদি কথা ও কর্মে উত্তেজক প্রেমের সে শিহরণ দেহমনে জাগাতে বিশেষভাবে পারঙ্গম হয় তাহলে ইমোশনাল মেল্টিং পয়েন্টে পৌঁছনোর ঘটনাটি ঘটতে পারে অতি দ্রুত। আফতাবের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই নিজের আজন্মপরিচিত গৃহ ত্যাগ করেছিল শ্রদ্ধা।

যৌনতা উপভোগের নেশায় বহু শিক্ষিত, প্রগতিশীল মেয়েই 'মাই বডি মাই চয়েস' নীতিতে

যৌনতার অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়েন, শ্রদ্ধা ওয়াকর এ বিষয়ে একমেবাদ্বিতীয়ম কিছু ছিল না। কিন্তু এসব ততক্ষণ পর্যন্ত মসৃণভাবে চলে যতক্ষণ ভাগ্যক্রমে 'আফতাব'দের মুখোমুখি তাঁরা পড়েন না। নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত আধুনিকা অনেক নারীই কামকলা উপভোগে পারঙ্গম এবং দ্বিধাহীন। কিন্তু নিজের প্রাণের বিনিময়ে পর্যন্ত যৌনতার আনন্দ উপভোগ করতে তাঁরা রাজি থাকেন, এমন ভাবার বোধহয় যথেষ্ট কারণ নেই। নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে পর্যন্ত যৌনতা উপভোগ করতে চাইবেন— মেয়েদের সেক্সুয়ালি এতখানি রাডিকালাইজড ভাবার তথ্যপ্রমাণ নেই। সঙ্গীনির্বাচনে সাবধানতা অবলম্বন তাই অনিবার্য। যৌন আবেদনে ভরপুর প্রেমিক খুঁজতে গিয়ে পাঁচজনের মধ্যে কোনজন 'আফতাব', তা আন্দাজ করার সহজতম উপায় নাম ও ধর্মপরিচয়। সুশীল সমাজের গায়ে ছ্যাঁকা লাগলেও কথাটি যুক্তির, আবেগের নয়।

মুসলমানের নীতিবোধ ভিন্ন প্রকারের। যে ভিন্নতা ভাবজগতে ব্যবধান সৃষ্টিকারী। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানের সাধারণ জীবনযাত্রা ও ন্যায়বোধ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে পৃথক আইনের (শরিয়া) দ্বারা। স্বাধীন ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি আইন (ইউনিফর্ম সিভিল কোড) না থাকায় মুসলমান ও হিন্দুর মনন, চিন্তন ও ঔচিত্য তথা ন্যায়বোধ অতিমাত্রায় পৃথক। অথচ মানুষে মানুষে সাম্যের ত্রুটিপূর্ণ ভাবব্যাখ্যা এহেন পার্থক্যের যথাযথ উপলব্ধিতে এতকাল বাধা সৃষ্টি করে এসেছে। আমরা ভুলতে বসেছি যে সাম্য প্রতিষ্ঠার অত্যাবশ্যক শর্ত হলো স্বতঃস্ফূর্ত ভিন্নতাকে মান্যতা দেওয়া। অথচ এই সমাজে একশ্রেণীর মানুষ 'রিলিজিয়ন আলাদা তো কী হয়েছে, মানুষ সবাই এক'— জাতীয় বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন বলেই বিপন্ন হয়ে পড়ছে খোলামেলা সমাজে বাঁচতে চাওয়া শ্রদ্ধা ওয়াকররা। মুসলমান সমাজ খোলামেলা বাঁচার নীতিকে সমর্থন করে না। ইসলামি দুনিয়ার দিকে তাকালে তা বোঝাও দুরূহ কিছু নয়। রিলিজিয়নের এহেন ভিন্নতা ভাবজগতে ভিন্নতা আনে এবং মুসলমানের ভাবজগতের ভিন্নতাকে মান্যতা দেওয়ার মাধ্যমেই খোলামেলা সমাজে শ্রদ্ধাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা সম্ভব, নচেৎ নয়। এর অর্থ অবশ্যই এই নয় যে সব মুসলমানই আফতাবের মতো কাজ করবেন। কিন্তু কে তেমন করবেন না তা আগে থেকে বুঝতে মাইন্ড ম্যাপিং'-এর বিজ্ঞান একালের মানবসভ্যতা অদ্যবধি আয়ত্ত করতে পারেনি। যতক্ষণ তা আয়ত্ত না হচ্ছে ততক্ষণ গা জোয়ারি সাম্যের বেসুরো গান গাইতে গিয়ে আইন ও রিলিজিয়ন নির্দিষ্ট স্বতঃস্ফূর্ত অসাম্যের উপস্থিতিকে জোর করে অগ্রাহ্য করা মূর্খামিও, আবার ধূর্ততাও।

শ্রদ্ধার মৃত্যুর প্রসঙ্গে বার বার উঠছে নয়না সাহনী হত্যাকাণ্ডের কথা। নয়না সাহনী ছিলেন কংগ্রেস কর্মী আর তাঁর স্বামী সুশীল শর্মাও ছিলেন যুব কংগ্রেস নেতা ও বিধায়ক। সুশীলের আপত্তি ছিল স্ত্রী নয়নার মাতলুব করিমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্বে। সন্দেহ করতে শুরু করেছিল সুশীল যে মাতলুবের সঙ্গে চলছে নয়নার বিবাহবহির্ভূত অনৈতিক সম্পর্ক। অতঃপর ১৯৯৫ সালের ২ জুলাই রাতে বাড়ি ফিরে সুশীল দেখে মদ্যপানরতা নয়না টেলিফোনে কারুর সঙ্গে বাক্যালাপরত এবং সুশীলকে ঢুকতে দেখেই ফোনটি সে কেটে দেয়। সন্দেহপ্রবণ সুশীল সঙ্গে সঙ্গে রিডায়াল করে নম্বরটি এবং লাইনের ওপাশে শুনতে পায় মাতলুব করিমের গলা। মাথায় আগুন ধরে যায় সুশীলের। উত্তেজনায় ও যৌনঈর্ষায় অস্থির হয়ে প্রবল আঘাত করে বসে নয়নাকে যার ফলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় নয়না সাহনীর। ভয় পেয়ে স্ত্রীর মৃতদেহ নিকটবর্তী এক রেস্তোরাঁয় নিয়ে যায় সুশীল এবং সেখানকার ম্যানেজার কেশব কুমারের সহায়তায় তা ঢুকিয়ে দেয় রেস্তোরাঁর তন্দুরে, দেহ পুড়িয়ে প্রমাণ লোপাট করার উদ্দেশ্যে। কেশব কুমার পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও সুশীল শর্মা পালিয়ে যায় কিন্তু স্ত্রীকে হত্যা করার ৮ দিনের মাথায় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করে সুশীল। শ্রদ্ধা ওয়াকরের হত্যার সঙ্গে নয়না সাহনীর হত্যার ঘটনাটির আপাত সাদৃশ্য দুই আততায়ীর তরফ থেকে হত্যা পরবর্তীকালে প্রমাণ লোপাটের প্রয়াসের মধ্যে। কিন্তু দুই ক্ষেত্রে হত্যার কারণ পরস্পর বিপরীতমুখী।

সুশীলের এহেন মনোভাবের সাদৃশ্য বরং পাওয়া যাচ্ছে শ্রদ্ধা ওয়াকরের সঙ্গে কারণ খবরে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, শ্রদ্ধাও বাধা দিত আফতাবের ফোনালাপে। সুশীল যেমন সন্দেহ করত নয়নাকে,শ্রদ্ধাও হয়তো তেমনই সন্দেহ করত আফতাবকে। আফতাবের বহু নারীগমনে কি আপত্তি করত শ্রদ্ধা? অর্থাৎ সুশীলের যে মানসিকতার কারণে নয়নাকে খুন হতে হয়েছিল সুশীলের হাতে, শ্রদ্ধার ছিল সেই একই মানসিকতা, কিন্তু তার ফলে শ্রদ্ধা আফতাবকে হত্যা করেনি, বরং আফতাবই হত্যা করেছে শ্রদ্ধাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আফতাব ও সুশীলকে এক মাপকাঠিতে বিচার করলে চলবে না। সুশীল সহ্য করতে পারেনি অবিশ্বাসিনী স্ত্রী, আর

আফতাব সহ্য করতে পারেনি সন্দেহবাতিকগ্রস্ত, ঝগড়ুটে লিভ ইন পার্টনার। আফতাবের সহনশীলতা স্পষ্টতই সুশীলের চাইতে অনেক কম। উপরন্তু ৩৫ টুকরোয় কেটে ১৮ দিন ধরে টুকরোগুলিকে একে একে সরিয়ে ফেলার পর ৬ মাস কেটে গিয়েছিল, আফতাব নিজে থেকে এসে ধরা দেয়নি পুলিশের কাছে।

অন্যদিকে স্ত্রীকে হত্যা করে পালিয়ে যাওয়ার ৮ দিন কাটতে না কাটতেই সুশীল আত্মসমর্পণ করেছিল পুলিশের কাছে। ভয়ে, অনুশোচনায় নাকি স্ত্রীকে হারানোর শোকে? আফতাবের সেই ভয়, অনুশোচনা বা শোক হলো না কেন? সুশীলের মানসিকতার সঙ্গে মিল ছিল শ্রদ্ধার মানসিকতার আর আফতাবের সঙ্গে নয়না সাহনীর। এক মুহূর্তের জন্য ধরে নেওয়া যাক, শ্রদ্ধা নয়, আফতাবের লিভ ইন পার্টনার ছিল নয়না সাহনী। সেক্ষেত্রে আফতাব কি মাতলুব করিমের সঙ্গে নয়নার বন্ধুত্বে আপত্তি করত? নিজে যেমন বহু নারীগমন করে, নয়নাকেও কি তেমনই বন্ধুত্বের স্বাধীনতা সে দিত? এর উত্তর পাওয়া যাবে মুসলমান সমাজের দিকে তাকালে। গৌরকিশোর ঘোষ তাঁর 'প্রেম নেই' উপন্যাসে এক হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন সে সমাজের যেখানে পুরুষের বহুবিবাহে আপত্তি করার অধিকার নারীর নেই, কিন্তু নারীর জন্য পরপুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকানো নিষিদ্ধ। আফতাবের লিভ ইন পার্টনার হলে হয়তো নয়নার সঙ্গে মাতলুব করিমের বন্ধুত্বই হতো না কারণ মুসলমান সমাজের নিয়ম অনুযায়ী মুসলমান পুরুষ অন্য কোনো মুসলমান পুরুষের সঙ্গিনীর দিকে দৃষ্টি দেয় না। মাতলুব করিমও নিশ্চিতভাবেই আফতাবের সঙ্গিনীর দিকে দৃষ্টি দিত না। সুশীল শর্মার স্ত্রী হিসেবে নয়না ছিল একজন কাফিরের স্ত্রী, তাই তার দিকে দৃষ্টি দিতে করিমের বাধা ছিল না।

আফতাব-শ্রদ্ধার কাহিনি শুনে উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের রশিদ খান বলেছেন দোষ উভয়েরই ছিল। আফতাবের রাগ হয়ে গিয়েছিল, তার ফলে শ্রদ্ধার দেহ ৩৫ টুকরোয় কেন, চাইলে ৩৬ টুকরোতেও কাটতে পারত সে। অর্থাৎ আফতাব পুনাওয়ালা, রশিদ খানদের ভালোবাসতে হলে শ্রদ্ধা ওয়াকরদের মনে রাখতে হবে যে কেবলমাত্র একনিষ্ঠ ভালোবাসা দেওয়াই যথেষ্ট নয়, তাদের রাগিয়ে দিলে প্রাণ হারাতে হতে পারে।

একদল লোক যেমন শ্রদ্ধা-হত্যার ঘটনাকে পারিবারিক বিবাদ ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতে রাজি নয়, অন্য আর একদল তেমনই এই হত্যাকে লাভ জেহাদজনিত হত্যা বলে বিশ্বাস করে। আফতাব আমিন পুনাওয়ালার রিলিজিয়নগত পরিচয়টিই এই হত্যাকাণ্ডকে পারিবারিক বিবাদজনিত হত্যাকাণ্ড বলে ভাবতে বাধা সৃষ্টি করছে তাদের মনে। অর্থাৎ আফতাব আমিন পুনাওয়ালা যদি বাস্তবে একজন সাইকোপ্যাথ বা সাধারণ অপরাধীও হয়, তাহলেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করেন যে মুসলমান বলেই প্রেমের ছলে সে বধ করেছে শ্রদ্ধা ওয়াকরকে। প্রেম নয়, একজন অমুসলমান মেয়েকে নিজ রিলিজিয়নের প্রসারার্থে নিজশয্যায় টেনে আনাই ছিল উদ্দেশ্য, এমন মনে করেন তাঁরা। এঁরা এও মনে করেন যে আফতাবের পূর্ণ উদ্দেশ্য কোনো প্রকারে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল শ্রদ্ধার দ্বারা, সেই কারণেই হত্যা করা হয়েছে তাকে। এমন ভাবনা যেহেতু ভারতের সুবিশাল সংখ্যক মানুষের, তাই ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের প্রযোজ্য ধারা অনুযায়ী কেবলমাত্র হত্যার অপরাধের শাস্তি আফতাবের জন্য বরাদ্দ করাই যথেষ্ট বলে মনে হয় না। ভারতীয় আইন ও বিচারব্যবস্থার উচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পিছনে আফতাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল তাও চিহ্নিত করা। নচেৎ ন্যায়বিচার হবে না। বহু সাধারণ মানুষ ঘটনাক্রমে হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে, হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিতও হয়। কিন্তু ঘটনাক্রমের প্রারম্ভেও তার মানসিকতা নেতিবাচক উদ্দেশ্যপূর্ণই ছিল, এমন বলা যায় না।

অন্যদিকে, জেহাদের উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হওয়া ঘটনাক্রমে যদি হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শেষ হয়, তখন সেই হত্যার অপরাধটিই অপরাধীর একমাত্র অপরাধ তা বলা যায় না বরং হত্যার অপরাধের পিছনে লুকিয়ে থাকে আর একটি গর্হিত উদ্দেশ্যপূর্ণ মানবাধিকার ও বিশ্বাসঘাতী অপরাধকৃত্য। দুইয়ের বিচার এক হতে পারে না। এই কারণে প্রয়োজন দেশের সমস্ত ইন্টার-কমিউনিটি (আন্তঃ সম্প্রদায়) অপরাধসমূহের জন্য দেশের ফৌজদারি আইনে পৃথক ধারার প্রবর্তন এবং এই জাতীয় অপরাধসমূহের বিচারের পৃথক বিধিব্যবস্থা। আন্তঃসম্প্রদায়গত অপরাধগুলির পিছনে জেহাদগত কারণ লুকিয়ে আছে কি না তার নির্ণয়নের প্রয়োজনেই এহেন পৃথক বন্দোবস্ত আবশ্যক।

প্রাচীন ভারতবর্ষ নরনারীর অনায়াস খোলামেলা জীবনের সাক্ষী থেকেছে। যে সভ্যতায় মানবহৃদয়ের মূল্য সর্বাধিক, সেই স্থানে যৌনতার মূল্য মানবিকতা তথা মানবাধিকারের মূল্যকে ছাপিয়ে ওঠে না। যৌনতা নিয়ে ছুঁৎমার্গ ঋষি বাৎস্যায়নের ভারতবর্ষে তাই ছিল না। কিন্তু সহস্র বছরের বৈদেশিক শাসনে বিধ্বস্ত ভারতবর্ষে পরিবর্তন ঘটেছে জনবিন্যাস ও সভ্যতাবোধের। এ হেন সমাজে ছুঁত মার্গহীন খোলামেলা যৌনজীবনযাপন সাধারণভাবে বিপজ্জনক হয়ে উঠলেও বহু মানুষ সেই বিপদের আঁচ দুর্ঘটনা ঘটার আগে পর্যন্ত টের পান না। এবং সে হেন বিপদ থেকে সাবধানতা অবলম্বনের জন্য খোলামেলা জীবনযাপনের অভ্যাসের সঙ্গে আপোশ করতেও চান না। গণতন্ত্রে তাঁদের এমন না-চাওয়ার মূল্যও অপরিসীম। খোলামেলা জীবনযাপনে তাঁদের সহায়তা করতে ভারতীয় গণতন্ত্রের উচিত আইন ও বিচারব্যবস্থায় দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তন আনা। বর্তমান ভারতে অপরাধী এবং ভিকটিম যদি ভিন্ন সম্প্রদায়ের হয়, তাহলে সেই প্রকার অপরাধের বিচারের আইনি ধারা এবং বিচারপ্রক্রিয়া ইনট্রা-কম্যুনিটি অর্থাৎ অন্তঃসম্প্রদায়গত অপরাধের বিচারের আইনি ধারা ও বিচারপদ্ধতি অপেক্ষা পৃথক হওয়া আবশ্যক। অমুসলমান ব্যক্তি অপর এক অমুসলমানের বিরুদ্ধে অপরাধ করলে তার মধ্যে জেহাদের ভাব বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে না কারণ অমুসলমানের ভাবজগতে 'জেহাদ', 'কাফির' আদি কোনো অবধারণার অস্তিত্ব নেই। ফলে যে অপরাধ সে করেছে সেইটিই প্রাথমিক তথা একক অপরাধ হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু মুসলমান অপরাধী অমুসলমানের বিরুদ্ধে অপরাধ করলে সেইটিই প্রাথমিক ও একক অপরাধ নাকি সেইটি আনুসঙ্গিক এবং জেহাদই উক্ত অপরাধের মূল চালিকা শক্তি, তা ভিন্ন আইন ও ভিন্ন বিচার পদ্ধতি ব্যতীত কেবলমাত্র অপরাধের প্রকৃতি থেকে নির্ণয় করতে পারা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে, অমুসলমান অপরাধী মুসলমানের বিরুদ্ধে অপরাধ করলেও নিশ্চিত করা প্রয়োজন যে সেই অপরাধেরও মূলগত উৎপত্তি সম্প্রদায়গত ঘৃণার মধ্যে রয়েছে কি না। ফলে সেই অপরাধের বিচারও ইন্টার-কমিউনিটি (আন্তঃ সম্প্রদায়গত) অবরাধের বিচারের পৃথক ব্যবস্থার আওতায় আসা প্রয়োজন। এমত পৃথক ব্যবস্থার দ্বারা লাভ জেহাদের অস্তিত্বসংক্রান্ত পরিসংখ্যানও (যে পরিসংখ্যান বর্তমানে উপলব্ধ নেই) উপলব্ধ হতে পারবে ভারতীয় গণতন্ত্রের কাছে। শ্রদ্ধা-হত্যার ঘটনা দিশা নির্দেশ করছে যে ইন্টার-কমিউনিটি (আন্তঃসম্প্রদায়) অপরাধের বিচারে দেশের ক্রিমিনাল প্রসিডিয়োর কোডে ভিন্ন ধারা এবং ভিন্ন বিচারপ্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। ■

একটি ধর্মনিরপেক্ষ হত্যা ও কিছু প্রশ্ন

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

নিজের কন্যাসন্তানকে 'লাভ জিহাদ' সম্বন্ধে সচেতন করি, তাদের সব্যসাচীর সঙ্গে আব্দুলদের পার্থক্য বোঝাই, আর যদি আজও তাদের এই পার্থক্য বোঝাতে না পারি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমার সোনামণিটিও হয়তো কোনোদিন নিজের অজান্তে রশিদ, জাকির, সোহেল, জাহাঙ্গিরের সুটকেশে অথবা রিজবানুরের ৫০০ লিটারের রেফ্রিজারেটরে ঠাঁই নেবে।

ক'দিন ধরে পথে-ঘাটে হাটে-বাজারে একটা কথা খুব চলছে— সৎসঙ্গে স্বর্গে বাস, অসৎসঙ্গে ফ্রিজের লাশ। বুঝে গেছেন নিশ্চয়ই কার কথা? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, মহারাষ্ট্রের পালঘর নিবাসী শ্রদ্ধা মদন ওয়াকার নামে ধর্মনিরপেক্ষ সোশ্যালিস্ট প্রোগ্রেসিভ মডার্ন মেয়েটি, যে চার বছর আগে ২০১৯-এর কোনো এক দিনে তথাকথিত উচ্চশিক্ষার দম্ভে তার জন্মদাতা মা-বাবার ২৭ বছরের স্নেহ-আদর- ভালোবাসা ভুলে, তাঁদের সাবধানবাণী দু'পায়ে মাড়িয়ে, উদ্ধত কণ্ঠে বলেছিল— 'তোমরা ভুল! আমার আফতাব লেখাপড়া জানা মডারেট মুসলমান, খুব ভাল ছেলে। আমি তোমাদের ধর্মটর্ম মানি না। ভালোবাসাই মানুষের একমাত্র ধর্ম— যা আফতাব আমাকে দিয়েছে। আমি তার সঙ্গে থাকতে চললাম।' তারপর কেটে গেছে প্রায় চার চারটে বছর। ২০২২-এর এই সেদিন রাজধানী দিল্লির এক সুসজ্জিত বহুতলে 'আমার আফতাব'-এর উন্মত্ত প্রেমের ছুরিতে ৩৫ খণ্ডে বিভক্ত হয়ে সে যখন আফতাবের সদ্যকেনা রেফ্রিজারেটারে সযত্নে ঠাঁই পেল, তখন তার ধড় বিচ্ছিন্ন মুণ্ডটা বোধহয় নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল যে--- 'আমার আফতাব সত্যিই অন্যদের মতো না। আমাকে সে খুন করলেও বাকিদের মতো সুটকেশে দমবন্ধ করা গরমে রাখেনি, আমার জন্য নতুন ফ্রিজ কিনে 'এসি'-র আরামে রেখেছে।' প্রাণ ভরা ভালোবাসা যে শুধু হৃদয়ে নয় ফ্রিজেও জমিয়ে রাখা যায়, এই প্রথম বুঝল গোটা দেশ।

বহু বছর পরে দিল্লির বুকে রচিত হলো আরেক অনন্য প্রেম কাহিনি, যা নিয়ে আজকালকার সমাজবিজ্ঞানের ছাত্ররা নতুন গবেষণার থিসিস তৈরি করতে পারে। বিষয়টি হলো— প্রেম ভালোবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটি? মোগল আমলে ১৪তম সন্তানের জন্ম দিতে যাওয়া সম্রাট শাজাহানের ৭টি বিবির চতুর্থ মমতাজ বেগমের লেবাররুমে বেঘোরে প্রাণ ত্যাগ করার দুঃখে তৈরি স্মৃতিসৌধ তাজমহল, নাকি শ্রদ্ধা ওয়াকারের ৩৫ খণ্ডে খণ্ডিত কাটা লাশ সযত্নে গচ্ছিত রাখার জন্য প্রেমিক আফতারের কেনা সতেরো হাজার টাকার ৩০০ লিটারের দামি ফ্রিজ? কথাগুলি কৌতুকের হলেও বিষয়টি কিন্তু গভীর উদ্বেগের। এটি কোনো নতুন ঘটনা নয়। আজকাল এরকম ঘটনা আখছারই ঘটে চলেছে। কোনোটি মিডিয়ার দয়ায় জনসমক্ষে প্রকট, আবার কোনোটি প্রচারহীন নিষ্প্রভ। ক্রমবর্ধমান ঘটে চলা এই ঘটনাগুলি আজকে সমাজের কাছে এক বড়ো প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে। প্রশ্ন হলো, হত্যার মূল দোষী কে? শ্রদ্ধা নিজে? প্রেমিক আফতাব? তার পিতা-মাতা? এই মোহময়ী ক্ষয়িষ্ণু সমাজ? নাকি তথাকথিত সেকুলার বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী, ফিল্মমেকার, লেখক- সাহিত্যিক-কবি, রাজনৈতিক দল যারা প্রতিনিয়ত তাদের লেখায়, কথায়, শিল্পে, সাহিত্যে, সিনেমায় হিন্দু মেয়েদের মুসলমান যুবকদের সঙ্গে প্রেম বন্ধনে আবদ্ধ হতে উৎসাহ জোগাচ্ছে— কে প্রকৃত দোষী? শ্রদ্ধার এই করুণ পরিণতি মোটেই নতুন ঘটনা নয়, বিগত প্রায় ২০/২৫ বছর ধরে 'লাভ জিহাদ' শব্দটি কেরল হাইকোর্ট-সহ বহু পিতা-মাতা ও সামাজিক সংগঠনের দ্বারা বহুল প্রচলিত। মুসলমান যুবকরা, বলা ভালো মেয়েধরা ছেলেরা কখনও বন্ধুত্বের ছলে, কখনও প্রেমিকের বেশে, আবার কখনও-বা ভবিষ্যতে সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখিয়ে, ছলনার টোপে গেঁথে একটু একটু করে হিন্দু মেয়েদের যখন ডাঙায় তুলছে তখন তাদের মা-বাবা, অভিভাবকরা কী করছিলেন? কাফের মেয়েদের কলমা পরিয়ে চার বিবির হারেমে বন্দি রেখে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত করে জান্নাত লাভের যে থিয়োরি ১৪০০ বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছে এই বিষয়ে তারা কেন অবহিত নন? প্রতিবেশীর মনোভাব, আচারবিচার পুঙ্খানুপুঙ্খ জানা তো প্রতিবেশীর

অবশ্য করণীয় কর্তব্য। নাহলে তাদের কন্যা সুরক্ষিত থাকবে কী করে? এই অজ্ঞতা কি এর মূল কারণ নয়?

মুসলমানদের সঙ্গে এদেশের হিন্দুদের মিল কীসে? দেখতে একই, কিন্তু আচার ব্যবহার, বেশভুষা, খাদ্যাভ্যাস, ভাষা, শিক্ষা, রীতিনীতি, ঈশ্বর বিশ্বাস, ধর্মীয় উৎসব, বিবাহ পদ্ধতি— সবইতো হিন্দুর থেকে পৃথক। কোথাও বিন্দুমাত্র মিল নেই। শ্রদ্ধার মা-বাবা কি এসব জানেতন না? শিশুকন্যা শ্রদ্ধাকে মানুষ করার সময়— সে বড়ো হয়ে এই সমাজে যাদের সঙ্গে মিশবে— সেই বিসম-ধর্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের জীবনশৈলী সম্বন্ধে তারা কি অবগত করিয়েছিলেন? তারা কি কে মানুষ আর কারা পশুর যেয়েও অধম তার পার্থক্য বুঝিয়েছিলেন? নাকি সেকুলারিজমের নামে মনুষ্যরূপী সকলকেই সমান হিসেবে ভাবতে শিখিয়েছিলেন? বোধ করি শ্রদ্ধাকে মানুষ করার পদ্ধতিতেই বেশ কিছু ফাঁকফোকর রয়ে গিয়েছিল। একদিন যাকে বড়ো হয়ে মনুষ্যরূপী হিংস্র পশুদলের চক্রব্যূহে পড়তে হবে, সেই চক্রব্যূহ ভেদ করে বেরোবার পথ শ্রদ্ধার বাবা-মা তাকে শেখালেন কই? যে বয়সে তারা তাকে পরম স্নেহে আদর করেছেন, নামি স্কুলে পড়িয়েছেন, প্রিয় খাবার খাইয়েছেন, কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন, কিন্তু শেখাননি শুধু মনুষ্যরূপী জানোয়ারদের থেকে দূরে থাকার কৌশল। শ্রদ্ধাকে যদি বালিকা অবস্থাতেই শেখানো হতো নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠতম গুণ, যদি বলা হতো বেদ-উপনিষদের শিক্ষামূলক কাহিনি, যদি বোঝানো হতো গীতার ওই শ্লোকের অর্থ 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ'— তবে হয়তো সে ওই বিধর্মীর সঙ্গে প্রেমের অভিনয়ে রুচিবোধ করত না আর তার ওই ভয়াবহ পরিণতিও হতো না। তার বদলে মা-বাবা বোধহয় ছোট্ট শ্রদ্ধার কোমল মনে 'একই বৃন্তে দুইটি কুসুমের' গল্প শুনিয়ে, সবাই সমান, এই মিথ্যা স্তোকবাক্য বলে তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। শ্রদ্ধার এই পরিণতি তাঁদেরই ভুল শিক্ষাদানের ফল।

২০১৯-এ ছদ্ম প্রেমের চক্রব্যূহে পড়ে বাবা-মা-র ভালোবাসা ভুলে যখন থেকে আফতাবের ফ্ল্যাটে এসে উঠেছে শ্রদ্ধা তখন থেকে সে শুধু আফতারের ভোগলালসার শিকারই হয়ে উঠেছে। লিভ টুগেদারে অখুশি শ্রদ্ধা তাই যখনই বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে তখনই পেয়েছে চরম নির্যাতন। শুধু কি তাই? শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলার ফাঁকেই আফতাব অনলাইন ডেটিং অ্যাপের মাধ্যমে নতুন সঙ্গীর খোঁজ করেছে, জোগাড়ও হয়েছে। অবশেষে শ্রদ্ধা যখন তাকে বিয়ে করতে জেদ ধরে বসল ঠিক তখনই তার গলা টিপে, ধর্মীয় রীতি মেনে 'সর তন সে জুদা' পদ্ধতিতে মাত্র ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি ছোট্ট দেহটাকে বহুকষ্টে ৩৫টা খণ্ডে বিভক্ত করার কঠিন কাজটি শুধু শ্রদ্ধাকে প্রাণের থেকে ভালোবাসে বলেই করেছে আফতাব আমিন! শুধু কী তাই, শ্রদ্ধার শেষ সময়টা যাতে সুখের হয় তাই সেই মুণ্ডহীন লাশটাকে সযত্নে রাখার জন্য তার কষ্টার্জিত টাকা থেকে নগদ কড়কড়ে সতেরো হাজার টাকা খরচ করে ৩০০ লিটারের ফ্রিজ কিনে শ্রদ্ধার শরীরকে ৩৫টি প্যাকেটে ছ'মাস ভরে রেখেছে। এর মধ্যে সে আরও জোগাড় করেছে সেকুলার মানবতাবাদী চার হিন্দু প্রেমিকা— অদিতি মেহেতা, অদিতি গান্ধী, খুশবু শিন্ডে আর মানসী লোকরেকে। রেফ্রিজারেটোরে ভরা টুকরো টুকরো শ্রদ্ধাকে সাক্ষী রেখে আফতাব তাদের সঙ্গে উদ্দাম যৌন আনন্দ উপভোগ করেছে ক'দিন। তারপর অবশেষে ১৮ দিন ধরে দিল্লি জুড়ে চলেছে শ্রদ্ধা-আফতাবের অমর প্রেমের চিহ্ন 'মাংস খণ্ড' ছড়ানোর মহান কাজ।

এসব কিছু জানার পর অনেকেরই অভিমত--- দোষ আফতাবের নয়, কারণ আফতাবেরা আফতাবদের মতোই। তাদের কাছ থেকে এর থেকে বেশি আশা করা বৃথা। এসব করা তাদের মহান ধর্মীয় ও সামাজিক কর্তব্য। আমরাই বরং আমাদের ঘরের মেয়েদের 'লাভ জিহাদ'-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করাইনি। ছোটোবেলা থেকে যদি আমরা তাদের শেখাতাম গোরুকে মা বলে পুজো করা মানুষ, আর গোরুকে কেটে খাওয়া মানুষ কখনও সমান হতে পারে না— তবে হয়তো শ্রদ্ধারা বেঁচে যেত।

একদিকে মুসলমান বাড়ির মেয়েরা স্কুলে-কলেজে হাটে-বাজারে বোরখা আর হিজাবে নিজেদের ঢেকে রাখবে, তাদের সমাজ তাদেরকে বন্দি রাখবে খাঁচায়, অন্যদিকে হিন্দু ঘরের মেয়েরা ঘরে-বাইরে, উৎসবে-আনন্দে চঞ্চল বিহঙ্গের মতো উল্লাসে মেতে থাকবে। আর সেই অবাধ মেলামেশার সুযোগে মুসলমান মেয়েধরারা শকুনের দৃষ্টিতে স্থির লক্ষ্যে আমাদের ঘরের মেয়েদের 'লাভ জেহাদের' চক্রান্তে ফাঁসিয়ে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে। তারপর তার ধর্ম পরিবর্তন করে যখন তাদের দু'-তিন অথবা চার সতীনের সঙ্গে বিছানা ভাগ করে নিতে বাধ্য করবে, তখন হিন্দু মেয়েটির আর ফেরার পথ নেই। কৃতকর্মের অনুতাপ, লজ্জা, সংকোচ তাদের আর বাবা-মা-র কাছে পুরনো জীবনে ফিরতে দেয় না। সামনে তখন দুটি পথই খোলা— হয় এই পশুতর জীবন স্বীকার করা, নয় মৃত্যু। এটাই প্রকৃতপক্ষে বর্তমান যুগে 'একই বৃন্তে দুইটি কুসুমের' গল্প নিখাদ সেকুলারিজম্। 'কাবুলিওয়ালার বাঙ্গালি বউ সুস্মিতা মুখার্জি', শোনভদ্রের লক্ষ্মী সোনী, ঝাড়খণ্ডের প্রখ্যাত শুটার তারা সচদেব, গুজরাটের প্রাচী মৌর্য, রাজস্থানের মানসী শেঠীর মতো হাজার হাজার হিন্দু মেয়ের হৃদয় বিদারক ঘটনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই চক্রান্তের বেড়াজাল ভাঙতেই হবে। নাহলে আমাদের ঘরের শ্রদ্ধাদের নিস্তার নেই।

এই লেখা যখন লিখছি ঠিক তখনই আরও দুটি 'লাভ জিহাদের' খবর ভেসে উঠল ন্যাশনাল নিউজের চ্যানেলের পর্দায়। একটি উত্তর প্রদেশের, অন্যটি এই বাঙ্গলারই রাজধানী কলকাতার গড়িয়ার ঢালুয়াতে। দুটি ঘটনার পাত্রীরা যথারীতি হিন্দু কন্যা। আর পাত্র? ঠিক ধরেছেন একজন সুপিয়ান আর অন্যজন গফুর। সবার কর্মপদ্ধতি কিন্তু এক— সেই চিরাচরিত প্রেম প্রেম খেলা। একজনকে চার তলার ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে হত্যা, অপরজন লজ্জায় গলায় দড়ি দিতে বাধ্য হয়েছে। এসব ঘটনাবলী বারে বারে প্রমাণ দিচ্ছে— এই আফতাব, আব্দুল, সুপিয়ান, গফুররা প্রেমের আড়ালে যেটা করছে তার সঙ্গে ভালোবাসার বিন্দুমাত্র কোনো সম্পর্ক নেই। যেটা আছে সেটা হলো কাফের কন্যাকে ভোগ আর ধর্ম পরিবর্তনের উদগ্র বাসনা।

আর একটা ছোট্ট প্রশ্ন, নিজেরা নিজেদেরই জিজ্ঞাসা করুন— এই আফতাব বা আব্দুলের ফ্রিজে-সুটকেশে কেবল শ্রদ্ধা-সুনীতার লাশই-বা পাওয়া যায় কেন? কোনো আমিনা বা ফাতিমারই-বা নয় কেন? কারণটি সহজ। কারণ আফতাবরা তাদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছে, তাই তাদের কাছে অন্যরকম ব্যবহার আশা করা বৃথা।

অনেক হয়েছে। চলুন এবার ঘরে ফিরি। এবার থেকে শপথ নিই আমাদের ঘরের শ্রদ্ধাদের মানবতাবাদী সেকুলার তৈরি না করে ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবধারায় হিন্দু হিসেবে গড়ে তুলি। তাতে শ্রদ্ধারাও বাঁচবে, দেশও বাঁচবে। নিজের কন্যাসন্তানকে 'লাভ জিহাদ' সম্বন্ধে সচেতন করি, তাদের সব্যসাচীর সঙ্গে আব্দুলদের পার্থক্য বোঝাই, আর যদি আজও তাদের এই পার্থক্য বোঝাতে না পারি তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমার সোনামণিটিও হয়তো কোনোদিন নিজের অজান্তে রশিদ, জাকির, সোহেল, জাহাঙ্গিরের সুটকেশে অথবা রিজবানুরের ৫০০ লিটারের রেফ্রিজারেটরে ঠাঁই নেবে। ■

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের রাষ্ট্রীয় অধিবেশন

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের ৮ম ত্রিবার্ষিক রাষ্ট্রীয় অধিবেশন গত ১১ থেকে ১৩ অক্টোবর ব্যাঙ্গালুরুর চেন্নানহেল্লি জনসেবা বিদ্যা কেন্দ্রে সম্পন্ন হলো। সারা দেশের প্রতিটি রাজ্য থেকে ৩০০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গের তিন সংগঠন— বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের ৪৪ জন, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের ৮৫ জন এবং জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সঙ্ঘের ১৫ জন- সহ মোট ১৪৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। জম্মু, কাশ্মীর ও লাদাখ থেকে ৪১ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এবারের অধিবেশনের মূল বিষয় ছিল--'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে ইন্ডিয়া থেকে ভারতের দিকে'। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এক প্রতিবেদনে জানা যায়, গত ১ আগস্ট অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের উদ্যোগে দেশজুড়ে ২ লক্ষ ২০ হাজার বিদ্যালয়ে ভারতমাতা পূজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই অধিবেশনে সঠিক জনসংখ্যা নীতি, জাতীয় শিক্ষানীতির সঠিক প্রায়োগিক পরিকল্পনা এবং শিক্ষকদের ২১ দফা সমস্যার সমাধান বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। তিনজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে শিক্ষক সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপী প্রামাণিককে অখিল ভারতীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বৈঠক পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সংবর্গ অনুসারে বৈঠকে তিনি পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র শিক্ষা মিশন, মিড ডে মিল এবং রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতির বিষয় তুলে ধরেন। মহিলা সংবর্গের বৈঠকে রাজ্য মহিলা প্রমুখ পূর্ণিমা রায় রাজ্যের শিক্ষিকাদের পেশাগত সমস্যা ও সুরক্ষার কথা তুলে ধরেন। প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক কানুপ্রিয় দাস সম্পাদকদের করণীয় কাজের বিষয়ে আলোকপাত করেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিনিধি মণ্ডলীর প্রমুখ গুরুবন্দন কার্যক্রম এবং স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব অনুষ্ঠানের প্রতিবেদন পাঠ করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে রাষ্ট্রীয় সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেন সংগঠনের শক্তির পরিধি। তা সঠিক সময়ে সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োগ করতে পারলে অনেক বড়ো কার্যক্রম অনায়াসেই সফল হতে পারে। সরকারের নিকট তিনি দাবি জানান, গুণমানসম্পন্ন ও মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা ও শিক্ষকদের সমস্যার সমাধান করতে হবে।

সেবা ভারতী দক্ষিণ ২৪ পরগনার বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৬ নভেম্বর সেবা ভারতী দক্ষিণ ২৪ পরগনার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ বারাসাত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘে। ৪৫ জন সদস্য-সদস্যা অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচারক প্রমুখ অদ্বৈতচরণ দত্ত। বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন দক্ষিণ বারাসাত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বময়ানন্দ মহারাজ। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। সভায় বিগত বছরের কাজকর্মের বিবরণ, বিগত অর্থবর্ষের আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন ট্রাস্টের সম্পাদিকা শ্রীমতী কৃষ্ণা পাল। ২০২২-২৩ সালের কর্মসমিতির নাম ঘোষণা করেন সভার সভাপতি ড. রায়চৌধুরী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও শান্তিমন্ত্রের পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

উত্তরের সংস্কার ভারতী মালদহ চর্চাকেন্দ্রের বিজয়া সম্মেলন

গত ১৬ নভেম্বর উত্তরের সংস্কার ভারতী মালদহ চর্চাকেন্দ্রের বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সংস্কার ভারতীর মালদহ জেলার সহ সম্পাদিকা শ্রীমতী রুমা দে চৌধুরীর বাসভবনে। উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি সঞ্জয় নন্দী, মালদহ জেলা সভাপতি পরেশ চন্দ্র সরকার, জেলা সম্পাদক তথা প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ কিশোর কুমার সরকার। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন জেলা কোষাধ্যক্ষ সজল দত্ত, বেবী বাগচী, অনুশ্রী সরকার, তনুশ্রী চৌধুরী ও সুমিত ভট্টাচার্য। নৃত্য পরিবেশন করে শ্রেষ্ঠা চৌধুরী, নিলম সরকার, মৌমিতা চৌধুরী ও শ্রেয়সী পাড়ুই। তবলায় ছিলেন সুব্রত সরকার ও কিশোর কুমার সরকার। মন্দিরায় পরেশ চন্দ্র সরকার। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন নির্মাল্য দাস এবং গাজোল চর্চাকেন্দ্রের সংযোজক অশোক বক্সী। বক্তব্য রাখেন পরেশ চন্দ্র সরকার, কৌশিক দাস মজুমদার, সঞ্জয় নন্দী। অনুষ্ঠান সুচারুরূপে পরিচালনা করেন কিশোর কুমার সরকার।

শিলিগুড়িতে ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির জাতীয় আলোচনা সভা

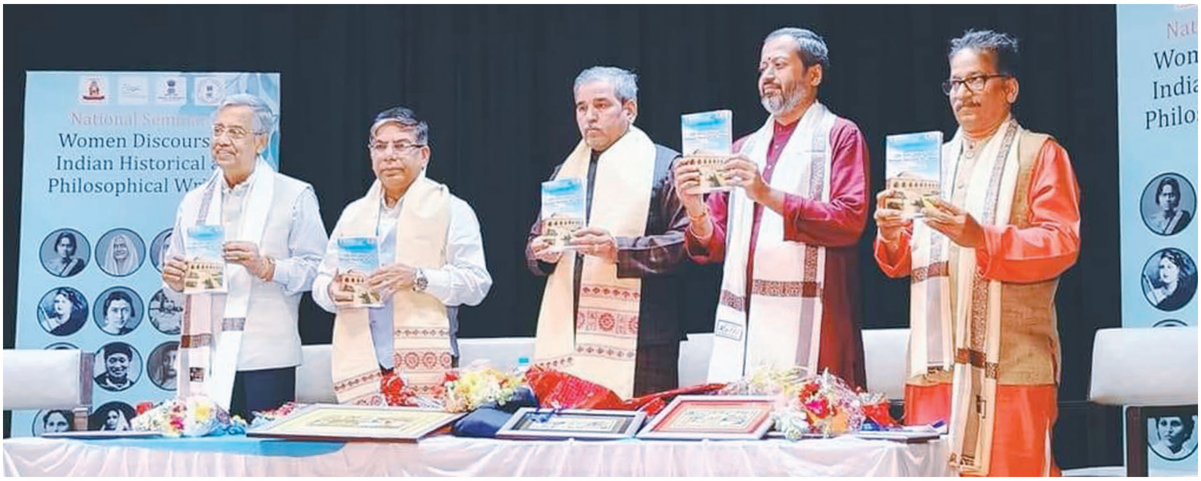

গত ১৯-২০ নভেম্বর শিলিগুড়ি শহরের সিটি সেন্টারে ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির জাতীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পক্ষে অধ্যাপক রবিরঞ্জন সেন জানান, দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বহু বিদগ্ধ অধ্যাপক ও গবেষক এই আলোচনা সভায় যোগ দেন। সংস্থার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কমিটির পদাধিকারীগণ উপস্থিত ছিলেন। দুদিন ব্যাপী এই আলোচনা সভায় শিলিগুড়ি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারাও অংশগ্রহণ করেন। মুখ্য অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার। ভারতীয় ইতিহাসে নারীশক্তির অবদান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট গবেষকরা। এক সময় একটি পুস্তক প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, বেশ কিছু মহীয়সী নারীর অবদান সম্পর্কে বর্তমান সমাজ অবগত থাকলেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সুপ্রাচীনকাল থেকে যে সব মহিলা সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অসমান্য কাজ করে গেছেন এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরাও যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, সেই লুকিয়ে রাখা ইতিহাসের পুনরুদ্ধার এবং তাঁদের অবদানকে কুর্নিশ জানাতে এই আলোচনা সভার আয়োজন।

দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

দীপক খাঁ

'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে
রয়েছে নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে
রয়েছে হৃদয়ে গোপনে।'

—রবীন্দ্রনাথের কথা। কিন্তু অপর এক দার্শনিক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল পাওয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভগবত গীতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ষষ্ঠ অধ্যায়ের ত্রিশ সংখ্যক শ্লোকটি সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণন বলেন, ওই শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে আমাকে সর্বত্র দেখে এবং আমার মধ্যেই সব কিছুকে দেখে তাঁর কাছে আমি হারিয়ে যাই না আর সেও আমার কাছে অপ্রকাশ হয় না।

শ্লোকটির ওই সাধারণ অর্থকে বিস্তার করে রাধাকৃষ্ণন লিখেছেন, তাঁর কাছে আমি হারাই না, আর তিনিও আমার কাছে হারান না। এই স্নেহপূর্ণ মর্মস্পর্শী মহাবাণীতে অতীন্দ্রিয়তার চেয়েও ব্যক্তিগত বাস্তব জীবনের রহস্যের উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের ইংরেজি অনুবাদে আকৃষ্ট হয়েই দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন জীবনের প্রথম পর্বেই (১৯১৮ খ্রিঃ) 'ফিলোজফি অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর' বইটি লেখেন ও প্রকাশ করেন। সেই সময় কবির সঙ্গে কোনওরকম পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও শুধু তাঁর রচিত কাব্য ও সাহিত্যের বিষয়বস্তুর অভিনবত্বেই তা হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রাণের অতি প্রিয় বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও পাণ্ডুলিপি তাঁরই কাছে পাঠিয়ে দিয়ে একটি ভূমিকা লেখার জন্য অনুরোধ জানান রাধাকৃষ্ণন।

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আপনার গ্রন্থের ভূমিকা লেখা আমার পক্ষে কঠিন। কারণ ও সম্বন্ধে লিখতে গেলে আমার কী করণীয় তা আমি জানি না। পাঠকের পথ করার জন্য যদি কিছু লিখতে হয় তাহলে আমাকে বলতেই হয়, সেরকম কিছু করা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ মহীশূরে যান। সেখানেই প্রথম মিলন ঘটে এই দুই মহান দার্শনিকের। সেই মিলন পরিণত হয় যে বন্ধুত্বে, তা অটুট থাকে আমৃত্যু। রাধাকৃষ্ণন স্বীকার করেছেন, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা তাঁকে প্রভাবিত করেছে ব্যাপকভাবে। এরপর রাধাকৃষ্ণন যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন, তখন দুজনের মধ্যে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ বাড়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার চার বছর পরে রাধাকৃষ্ণনের উদ্যোগে ও সভাপতিত্বে গঠিত হয় 'ভারতীয় দর্শন কংগ্রেস'। কলকাতায় সেই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই। রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি হবার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দর্শন নিয়ে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়। ভারতে শিক্ষায়তন স্তরে সৃজনশীল দর্শনচর্চার অগ্রগতি একসময় কেন বন্ধ

হয়ে গেল— সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য জানতে চান রাধাকৃষ্ণন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ভারতের দার্শনিক প্রতিভার বিকাশধারা বাঁধাধরা রাস্তায় প্রকাশ না পেলেও গতিহারা হয়নি এবং তার জীবনীশক্তিও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। তিনি আরও বলেন, ভারতের সৃজনশীল চিন্তাধারা, উচ্চতর স্তরে তার প্রকাশ ও অগ্রগতি রুদ্ধ করে দিয়ে একরকম অপ্রত্যাশিত ভাবেই চোয়ানো জলের মতো জনতার মনোভূমিকা সিক্ত করে, উর্বর করে তাঁর কাজ করে চলেছে। কবীর, দাদু এবং বঙ্গপ্রদেশের মধ্যযুগের বাউল বা অন্য ভবঘুরে কবিদের ভক্তিমূলক গীতি কবিতার মধ্যে দর্শনিক চিন্তার ওই ক্ষুদ্র অংশগুলি রাধাকৃষ্ণনের নজরে পড়েছে কিনা তা নিয়ে তাঁকে পালটা প্রশ্ন করেন। এই ভাবেই ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে আলোচনায় মত্ত হয়ে ওঠেন দুজনে।

১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ২ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণেই রাধাকৃষ্ণন শান্তিনিকেতনে আসেন। সেখানে কবির অনুরোধে ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মীদের সামনে এক সারগর্ভ ভাষণ দেন রাধাকৃষ্ণন। ওই সময় রাধাকৃষ্ণনের সম্মানে কবিগুরুর 'পরিশোধ' অভিনয় পরিবেশন করা হয় সিংহসদনে। এর আগে ১৯৩১-এর ২৬ ডিসেম্বর কলকাতা টাউন হলে রবীন্দ্রনাথের সত্তর বছর পূর্তিতে যে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন রাধাকৃষ্ণন।

সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, 'যখন আমাদের প্রভু ও নেতাদের কথা মানুষ ভুলে যাবে, তখন রবীন্দ্রনাথের কাব্য ও সংগীত আমাদের মুগ্ধ করে রাখবে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় হলেও কোনো গোষ্ঠী বা জাতিগত ভাবধারার মধ্যে তাঁর সৃষ্টি আবদ্ধ নয়— তাঁর সৃষ্টির সর্বজনীন উপাদান বিশ্বের অন্তরে স্পন্দন জুগিয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথ যেমন রাধাকৃষ্ণনকে আমন্ত্রণ করেছেন তেমনি রাধাকৃষ্ণনও সুযোগ পেলেই রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেছেন। যেমন ১৯৩৩ সালে রাধাকৃষ্ণন যখন অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, সেই সময় তিনি রবীন্দ্রনাথকে কয়েকটি ভাষণ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ১৯৩৩-এর ৮, ৯ ও ১০ ডিসেম্বর এবং পরের বছর ১৯৩৪-এর ২ ডিসেম্বর ওয়ালটেয়ারে এসে ওই বক্তৃতা দেন। এই ভাবে রবীন্দ্রনাথ ও রাধাকৃষ্ণন আধ্যাত্মিক অনুভূতি জগতের দুই পুরোধাপুরুষ হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি এবং হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন। দুজনের চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে দেশ ও বিশ্ব।

১৯৪০-এর ৭ আগস্ট অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে ডি.লিট উপাধি দেয়। প্রসঙ্গত, অনেক আগেই তাঁকে ডি.লিট উপাধি দেবার প্রস্তাব উঠেছিল। কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন আচার্য কার্জন সে সময় আপত্তি জানিয়ে বলেন, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক যোগ্য ব্যক্তি আছেন যাঁদের ডি.লিট উপাধি দেওয়া যেতে পারে।

কার্জনের এই সংকীর্ণ মনোভাবের যোগ্য জবাব দেন অক্সফোর্ডের পরবর্তী আচার্য হ্যালিফেম্। তিনি এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্মতি চাইলে তিনি রাজি হন এবং শান্তিনিকেতনেই অনুষ্ঠানটি করার অনুরোধ করেন। সেই মতো ১৯৪০-এর ৭ আগস্ট শান্তিনিকেতনেই অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে আসেন ভারতের তৎকালীন বিচারপতি স্যার মরিস গয়ার ও ড. রাধাকৃষ্ণন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের গভীর যোগসূত্র গড়ে তোলার লক্ষ্যেই রবীন্দ্রনাথ ওই বিশেষ সমাবর্তনটি সেখানে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ৭ ডিসম্বরেই রাধাকৃষ্ণন ও রবীন্দ্রনাথের শেষ সাক্ষাৎ। এরপর অবশ্য রাধাকৃষ্ণন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বহু ভাষণেই তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণনের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অটুট ছিল। কবি রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, কিন্তু তাকে ছাপিয়েও যেন মানুষ রবীন্দ্রনাথ, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ বেশি মুগ্ধ করেছিল রাধাকৃষ্ণনকে।

'দি গ্রেট ইন্ডিয়ানস' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণানের সশ্রদ্ধ উক্তি— 'সৎ জীবনযাপন ও সামাজিক শৃঙ্খলার কেন্দ্র হিসেবে আত্মার মূল্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে যেভাবে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন, তাই তাঁকে ভারতীয় মনীষার দীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছে। রাধাকৃষ্ণন ১৯৩৭ সালে ৩০ এপ্রিল লন্ডনে 'রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস'-এ যে বক্তৃতা দেন তাঁর বিষয়বস্তু ছিল হিন্দু চিন্তাধারার অতীন্দ্রিয়বাদ বা রহস্যময়তা নীতি। রাধাকৃষ্ণন তাঁর এই বক্তৃতার শিরোনাম দেন 'Mysticism and Ethics in Hindu Thought.'

ম্যানচেস্টার কলেজে রাধাকৃষ্ণন আপট্রন স্মারক বক্তৃতায় যে ভাষণ দেন তাতে সকলেই মুগ্ধ হন। হিন্দুজীবন ও দর্শন যেভাবে তিনি বিশ্লেষণ করে সবার সামনে উপস্থাপিত করেন এতে সমবেত শ্রোতারা অভিভূত হন। সেই সময় ওই ভাষণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করার দাবি ওঠে। কেননা যত বেশি মানুষ বিষয়টি জানতে পারবে ততই খসে যাবে অজ্ঞতার খোলস। হিন্দুধর্ম ও জীবন দর্শন সম্পর্কে যেসব অপপ্রচার আছে, যেসব ভুল ধারণা আছে, তা এর ফলে দূর হবে বলে তাঁরা মনে করেন।

রাধাকৃষ্ণনের দৃঢ় বিশ্বাস, সনাতন হিন্দুধর্ম নিছক দুঃখবাদ বা অদৃষ্টবাদের নামান্তর নয়। একই সঙ্গে হিন্দুধর্ম নিছক কতকগুলি আচার অনুষ্ঠান বা সমাজসেবামূলক কিছুও নয়। এগুলির চেয়েও হিন্দুধর্মে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় 'সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন এবং গভীর তত্ত্ব ও অধ্যাত্ম জ্ঞানের উপর'।

(শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিত বিহার

বিমলকৃষ্ণ দাস

বৈদিক যুগের জ্ঞান সাধনার এক ফলিত রূপ যেন দেখা গেল বৌদ্ধযুগে। এ নিয়ে কিছু বিতণ্ডা তৈরি হলেও হতে পারে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো উপরের আপাত কিছু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও দুটি দর্শনে ভাবনার অন্তর্সূত্র ছিল এক। তাই বৌদ্ধ শ্রমণদের অন্যতম লক্ষ্য ভোগবিমুখ হয়ে জ্ঞান আহরণ ও জ্ঞান বিতরণ--- মানুষের মধ্যকার চেতনাকে জাগ্রত করা। সে কারণেই সংঘারাম বা প্রতিটি বৌদ্ধবিহার হয়ে উঠেছিল এক একটি মহাবিদ্যালয়, বহুমুখী শিক্ষাকেন্দ্র। গড়ে উঠেছিল পৃথিবী বিখ্যাত এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়। উত্তর, পশ্চিম, পূর্বভারত জুড়ে গড়ে ওঠা এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেশ-বিদেশের জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করতো এখানে শিক্ষা গ্রহণের জন্য। বিদেশি তুর্কি আক্রমণে বহুবছর আগে এর সবগুলিই ধ্বংসপ্রাপ্ত। এর মধ্যে কতগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত, কতগুলি ইতিহাসের আড়ালে অবগুণ্ঠিত অবস্থায় পড়ে আছে। সেই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বাগ্রে মনে পড়বে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা--- বিশ্বসভ্যতার প্রথম ও প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়। ঐতিহাসিকদের অনুমান অনুসারে খ্রিঃপূঃ ৭০০-৬০০ অব্দের দিকে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়।

চাণক্য ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অধ্যাপক যার কৌশলে আলেকজান্ডার ফিরে যেতে (পরাজিত হয়ে!) বাধ্য হয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সম্রাটের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। এছাড়াও পাণিণি (ব্যাকরণবিদ) চরক (চিকিৎসা শাস্ত্রবিদ) জীবক (শল্যবিদ ও গৌতমবুদ্ধের চিকিৎসক) সকলে এখানকার অধ্যাপক ছিলেন। এর সঙ্গে ছিল—

(১) নালন্দা, কুমারগুপ্তের সময়ে (৪২৭ খ্রিঃ) মগধে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(২) ওদন্তপুরী মহাবিহার, পাটলিপুত্র।

(৩) বিক্রমশীলা মহাবিহার অষ্টম শতকের শেষে রাজা ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এটি বর্তমান ভাগলপুর জেলার অন্তিচক গ্রামে অবস্থিত ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে চীন, তিব্বত, গ্রিস, তুরস্ক, কোরিয়া, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য আসতেন।

(৪) সোমপুর মহাবিহার--- বর্তমান বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত ছিল। পাহাড়পুর মহাবিহার নামেও এটি পরিচিত।

(৫) জগদ্দল মহাবিহার— উত্তরবঙ্গের রাজা রামপাল এটি গড়ে তোলেন, এটি অধুনা বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার ধামাইরহাট উপজেলায় অবস্থিত ছিল।

(৬) পুষ্পগিরি বিশ্ববিদ্যালয় (ওড়িশা)— উদয়গিরি, রত্নগিরি ললিতগিরি পাহাড় অঞ্চলজুড়ে এর অবস্থান ছিল।

(৭) বল্লভী— গুজরাট, বর্তমান ভাবনগর জেলা। ২০১৭ সালে ভারত সরকার এটি পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

(৮) চন্দ্রপুর বিশ্ববিদ্যালয়— বর্তমান বাংলাদেশের সাগরনীল, জড়ী অঞ্চল সিলেটে অবস্থিত। এটি শ্রীচন্দ্রপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামেও পরিচিত। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্র কর্তৃক এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি এখনও আনেকাংশে অনাবিষ্কৃত।

এবার সেই হারিয়ে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। তুর্কি আক্রমণকারী বখতিয়ার খিলজি একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে, অগ্নিতে ভস্মীভূত করে যখন চরম নৃশংসতা, বর্বরতার পরিচয় দিচ্ছিল, তখন বেঁচে থাকা আবাসিক শিক্ষার্থী, অধ্যাপক, বৌদ্ধসন্ন্যাসীরা বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়। শত শত শিক্ষার্থী শ্রমণ অধ্যাপক নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী

থেকে পালিয়ে আশ্রয় নেয় ভারতবর্ষের এই প্রত্যন্ত পূর্ব সীমায় অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়। অনেকে বলেন তখন ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ধর্মান্তরিত হন, ভয়ে সংঘারাম ছেড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু ভারতের এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধ্বংসের পক্ষে এই যুক্তি দাঁড় করানো যায় না। কোথাও মতদ্বৈত, অনেক ক্ষেত্রে ভাবাত্মক বিভেদ ছিল, সে তো চিরন্তনী সমাজ চিত্র, কিন্তু তার ফলে এই বিশাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস হয়েছে তা বলা অসমীচীন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তখন সর্বতোমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় সম্রাট হর্ষবর্ধন আয়োজিত ধর্মমেলায় অগণিত বৌদ্ধ ও জৈন সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা যোগ দিতেন। তখন নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন শীলভদ্র। তাঁর সময়ে ছাত্রদের শুধু বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দেওয়া হতো না। বেদ বেদান্ত, হিন্দুদর্শন, ব্যাকরণ, ন্যায়, চিকিৎসা সব কিছুই ছিল পাঠ্যের তালিকায়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষেত্রে কোনও ভেদাভেদের উদাহরণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া শীলভদ্র তো বাঙ্গলার এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তানই ছিলেন। অতীশ দীপঙ্কর গৌড়ীয় রাজপরিবারের সন্তান। ইতিহাসকার রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন— 'দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে তুর্কি মুসলমান আক্রমণে প্রথমে মগধ ও পরে ভারতের উত্তর পূর্বে অবস্থিত বাঙ্গলার বৌদ্ধ বিহার ও সংঘারামগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।' —এটিই প্রকৃত সত্য।

অনুমান করা হয় (বর্তমানে অনেকাংশে প্রমাণিত) এই পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল ভারতের একদম দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে চট্টগ্রামের (অধুনা বাংলাদেশ) দেয়াং পাহাড় অঞ্চলে। পালরাজা ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় (৭৭০—৮১৩ খ্রিঃ)। শাস্ত্রশিক্ষা, অধ্যাপনা, অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকরা যে গান, দোঁহা ইত্যাদি রচনা করেছিলেন সেগুলিই পরবর্তীকালে চর্যাপদ হিসেবে বাংলাভাষা বা কাব্যের আদিরচনা হিসেবে স্বীকৃত হয়। তিব্বতীয় ইতিহাসবিদ লামা তারানাথ 'The History of Buddhism in India (1708 C.E.) গ্রন্থে এখানকার শিল্প, শিক্ষা, ভাস্কর্য সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে আলোচনা, বিতর্ক সভা হতো এখানে। উচ্চশিক্ষার জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও বিদ্যার্থীরা এখানে অধ্যয়নের জন্য আসতেন। চট্টগ্রামের কৃতীসন্তান মহাশক্তি প্রজ্ঞাভদ্র (তিলোপাদ) ছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু তিলোপাদ ছিলেন বর্তমান পাটিয়া উপজেলার চন্দ্রমালা গ্রামের এক ব্রাহ্মণের সন্তান। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় প্রজ্ঞাভদ্র। একসময় চট্টগ্রাম ছিল আরাকান রাজের অধীনে। রাজা বৌদ্ধ অনুরাগী ছিলেন বলে পণ্ডিত বিহারের কোনো সমস্যা হয়নি। ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে সুলতানি আমলে ফকরউদ্দিন মোবারক শাহ চট্টগ্রাম অধিকার করে সেখানে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা করে। কথিত যে, প্রায় আট হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু, শ্রমণ, পণ্ডিত ছিল এখানে। তখন রাজা ছিলেন দেব বংশীয় রাজা কান্তিদেব। রাজধানীর নাম ছিল বর্ধমান পুর, আনোয়ারা উপজেলায়, যার বর্তমান নাম বরোটান। মুসলমান শাসনের অত্যাচার পণ্ডিত বিহারের উপরেও প্রভাব ফেলে। ক্রমশ ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে মোগলরা আরাকান রাজ্য জয় করে এবং চট্টগ্রামও দখল করে নেয়। দীর্ঘ সময় জুড়ে ভয়াবহ যুদ্ধে পণ্ডিত বিহারও ধ্বংস হয়ে যায় বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। দলে দলে বৌদ্ধ ভিক্ষু, পণ্ডিত শ্রমণ তখন তিব্বত-নেপাল অঞ্চলে পালিয়ে যায়। কালের আবর্তে ধীরে ধীরে হারিয়ে যায় পণ্ডিত বিহার।

আনন্দের বিষয় যে, বাংলাদেশ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পণ্ডিত বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থানটি সম্প্রতি চিহ্নিত করা হয় এবং তার ইতিহাস পুনরুদ্ধারের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক ভাবে পঞ্চাশ একর জমির উপরে 'Revival of ancient university---Pandit Bihar'। এই নামে একটি আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যথাসম্ভব এক হাজার বছর আগের পণ্ডিত বিহারের তৎকালীন মৌলিকত্বকে এর মধ্যে ধরে রাখা এবং আধুনিক বহুমুখী একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনই বর্তমান লক্ষ্য।

ভারতের গৌরব, ভারতের উন্নত শিক্ষা সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন বাকি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান সমূহের পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার যদি সম্ভব হয় তবে তা শুধু ভারতবাসী নয়, সমস্ত পৃথিবীর কাছেই হবে জ্ঞান সাধনার ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। তাছাড়া ভারতের ইতিহাসকে বিকৃত করে যশস্বী হওয়ার মানসিকতা সম্পন্ন দেশি-বিদেশি গোষ্ঠীসমূহ নিশ্চয়ই কিছু আলোর সন্ধানও পাবেন। □

আমাদের সংবিধান ভারতের প্রাচীন মহান ঐতিহ্য বহন করে চলেছে : নরেন্দ্র মোদী

কিছু নির্দিষ্ট দিন এবং উপলক্ষ্য রয়েছে যা অতীতের সঙ্গে আমাদের বন্ধনকে শক্তিশালী করে। ২৬ নভেম্বর এরকমই একটি ঐতিহাসিক দিন। এই দিনে ৭৩ বছর আগে আমাদের দেশে সংবিধান গৃহীত হয়।

সাত দশক আগে পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল পবিত্র কণ্ঠ। সংবিধানের প্রতিটি অনুচ্ছেদে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিতর্ক হয়েছে। যুক্তি, তথ্য ও ধারণার আদানপ্রদান হয়; বিশ্বাস, স্বপ্ন ও সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একভাবে, পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলের এই জায়গাটি ছিল জ্ঞানের মহাকুম্ভ, যেখানে সারা দেশ থেকে ভারতের মানুষের স্বপ্নগুলিকে শব্দের মাধ্যমে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ, ড. ভীমরাও বাবাসাহেব আম্বেদকর, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, পণ্ডিত নেহরু, মৌলানা আজাদ, পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন, সুচেতা কৃপালনী, হংস মেহতা, এলডি কৃষ্ণস্বামী আইয়ার, এন গোপালস্বামী আয়েঙ্গার-সহ অগণিত বিশিষ্টজন সংবিধান গঠনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অবদান রেখেছেন। আজকে যদি আমাদের সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেওয়া হতো তাহলে কী হতো একবার ভাবুন। স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশপ্রেম এবং ভারত ভাগের ভয়াবহতা সত্ত্বেও জাতীয় স্বার্থ ছিল সর্বাগ্রে এবং এটিই ছিল সবার হৃদয়ে একমাত্র মন্ত্র। আজকের প্রেক্ষাপটে বহু ভাষা, উপভাষা, গোষ্ঠী এবং রাজ-রাজ্যের বৈচিত্র্যে ভরা গোটা দেশকে সংবিধানের মাধ্যমে আবদ্ধ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কৌশল প্রণয়ন করতে গিয়ে আমরা সংবিধানের একটা পাতাও লিখতে পারতাম কিনা জানি না। আমি সেই মহান ব্যক্তিদের অভিবাদন করতে চাই কারণ, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও তারা একসঙ্গে সংবিধান রচনা করেছিলেন এই বিশ্বাসে যে জাতীয় স্বার্থ সবকিছুর ঊর্ধ্বে।

আমাদের সংবিধান শুধু অনুচ্ছেদ সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। আমাদের সংবিধান সহস্রাব্দের নিরবচ্ছিন্ন ঐতিহ্যের আধুনিক বহিঃপ্রকাশ। ফলে আমাদের সংবিধানকে ভাব ও নিয়ম উভয়ভাবেই মেনে চলতে হবে। যখন আমরা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে সংসদ পর্যন্ত জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই সাংবিধানিক ব্যবস্থাটি পূরণ করি, তখন আমাদের অবশ্যই সংবিধানের প্রতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে। এটা করতে গিয়ে আমরা সংবিধানের ধারণাকে উপেক্ষা করতে পারি না। তাই সংবিধানের আলোকে আমাদের কাজ সঠিক না বেঠিক তা মূল্যায়ন করার জন্য প্রতি বছর সংবিধান দিবস পালন করা উচিত। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতের সংবিধান কার্যকর হয়েছিল। দেশে ২৬ নভেম্বর দিনটিকে সংবিধান দিবস হিসেবে পালনের ঐতিহ্য তৈরি করতে হবে যাতে দেশের তরুণ প্রজন্ম বুঝতে পারে কীভাবে আমাদের সংবিধান গঠিত হয়েছিল, কারা সংবিধান রচনা করেছিলেন, কোন পরিস্থিতিতে এটি তৈরি করা হয়েছিল, কেন করা হয়েছিল, কোথায়, কীভাবে এবং কার জন্য সংবিধানের সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতের সংবিধান শুধুমাত্র পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান নয়, এটি একটি সামাজিক দলিল, যা ভারতবর্ষের মতো বৈচিত্র্যময় দেশের প্রধান শক্তিশালী স্তম্ভে পরিণত হয়েছে।

সংবিধান দিবস উদ্‌যাপনের জন্য বাবাসাহেব আম্বেদকরের ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর চেয়ে বড়ো উপলক্ষ্য আর কী হতে পারে? বাবাসাহেব আম্বেদকর আমাদের দেশকে সবচেয়ে মূল্যবান উপহার দিয়েছেন এবং আমাদের চিরকাল সংবিধানকে শাস্ত্র মেনে নিয়ে তাঁকে স্মরণ করা উচিত। সংবিধান গৃহীত হওয়ার একদিন আগে ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর বাবাসাহেব আম্বেদকর তাঁর সমাপনী ভাষণে যা বলেছিলেন তা আমাকে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। বাবাসাহেব দেশকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারত ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অতীতে নিজেদের ভুলের কারণ আমরা আমাদের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের চরিত্র হারিয়েছি বলেও দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি।

এমতাবস্থায়, বাবাসাহেব দেশকে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, আমরা গণতান্ত্রিক দেশও হয়েছি; কিন্তু আমরা কি তা বজায় রাখতে পেরেছি? আমরা কি অতীত থেকে শিক্ষা নিতে পারি?' আজ যদি বাবাসাহেব থাকতেন, তাহলে তিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। কারণ ভারত বছরের পর বছর তার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে আরও সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করেছে। তাই সংবিধান দিবসে

ফঃ ৫

আমি আইনবিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সব সহকর্মীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাই যাঁরা গত সাত দশকে সংবিধানের চেতনাকে অটুট রেখেছেন। আমি বিশেষ করে ১৩০ কোটি ভারতীয়দের সামনে মাথা নত করছি যারা গণতন্ত্রের প্রতি ভারতের বিশ্বাসকে কখনোই কম হতে দেবেন না। আমাদের সংবিধানকে সর্বদা একটি পবিত্র গ্রন্থ, পথনির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

সংবিধানের ৭৩ বছরের ইতিহাস আমাদের জন্য আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের মিশ্র আবেগ নিয়ে এসেছে। আনন্দের বিষয় হলো সংবিধানের চেতনা বজায় রয়েছে। যদি কখনও সংবিধানের চেতনা লুপ্ত করার প্রচেষ্টা করা হয়ে থাকে, দেশবাসী সম্মিলিতভাবে তা ব্যর্থ করেছে। আমাদের সংবিধানের শক্তিতেই আমরা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গঠনের পথে অগ্রসর হতে পেরেছি। সংবিধানের পরিধির মধ্যেই আমরা একসঙ্গে সব সংস্কার করেছি। এই বিশাল ও বৈচিত্র্যময় ভারতের জন্য, একটি সোনালি, প্রগতিশীল ভবিষ্যতের জন্য, একটি নতুন ভারতের জন্য, কেবলমাত্র সংবিধান, সংবিধানের সীমাবদ্ধতা এবং সংবিধানের চেতনার উপরেই আমরা নির্ভর করতে পারি। আমাদের সংবিধান আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়ো এবং পবিত্র গ্রন্থ। এমন একটি বই যাতে আমাদের জীবন, আমাদের সমাজ, আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের আচার-আচরণ, আমাদের নীতি-নৈতিকতা সবই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে অনেক সমস্যার সমাধানও রয়েছে। আমাদের সংবিধান এত বিশাল কারণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত, বিশ্বাস অবাধ।

২০১৪ সালে লালকেল্লা থেকে কথা বলার সময় আমি যা বলেছিলাম তার আমি পুনরাবৃত্তি করব। যদি আমাকে সংবিধানকে দুটি শব্দে বর্ণনা করতে হয়, আমি বলব 'ভারতীয়দের জন্য মর্যাদা এবং ভারতের জন্য ঐক্য।' আমাদের সংবিধান প্রত্যেক নাগরিকের মর্যাদার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এটি ভারতের ঐক্য ও অখণ্ডতা বজায় রেখেছে। আমাদের সংবিধান বিশ্ব গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। এটা শুধু আমাদের অধিকার সম্পর্কেই সচেতন করে না, আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন করে তোলে। আমাদের সংবিধান একটি নির্দিষ্ট অর্থে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে পন্থনিরপেক্ষ।

আমরা কী অর্জন করতে পারি, আমাদের স্বপ্ন কত বড়ো হতে পারে বা আমরা কোথায় যেতে পারি তার কোনও সীমাবদ্ধতা নেই। সংবিধানে অধিকারের কথা বলা হয়েছে এবং সংবিধানে নাগরিকদের কর্তব্য পালনের কথাও উল্লেখ রয়েছে। আমরা যেমন ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের অংশ হিসেবে দায়িত্ব পালন করি, তেমন আমাদের সংবিধান, দেশের প্রতিও দায়িত্ব সম্পর্কেও সচেতন ও আন্তরিক হতে হবে। যেমন রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেছিলেন, সংবিধানে যা লেখা নেই তা আমাদের অবশ্যই প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা ভারতের এক বিশেষত্বও বটে। আমরা সাম্প্রতিক দশকগুলিতে আমাদের অধিকারের উপর জোর দিয়েছি, যা প্রয়োজনীয় ও সঠিক ছিল। কারণ সমাজে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এই বৃহৎ গোষ্ঠীর মধ্যে সমতা ও ন্যায়বিচারের বোধ জাগানো সম্ভব হয়েছে তাঁদের অধিকারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর।

যাইহোক, নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য, দায়িত্ব ও অধিকার সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কারণ আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন না করলে আমাদের অধিকার রক্ষা করতে পারি না। সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তবে, তাঁরা যদি সচেতনভাবে তাঁদের সন্তানকে মাতৃভাষা শেখার জন্য জোর দেন তবে তাঁরা নাগরিক হিসেবে সঠিক দায়িত্ব পালন করছেন, দেশের সেবা করছেন। একজন সাধারণ নাগরিক যিনি জল সংরক্ষণ করছেন, তিনিও নাগরিক দায়িত্ব পালন করছেন, দেশের বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করছেন। এ বছর স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এটাই অমৃত কাল। ভারতীয় নাগরিকদের নিজদের অধিকারের জন্য লড়াই করা স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ ব্রিটিশরা দীর্ঘদিন ধরে এ দেশের মানুষদের অধিকারে বাধা দিচ্ছিল। মহাত্মা গান্ধী-সহ সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয়দের সমান অধিকার থাকা উচিত। তাই তাঁরা আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন। তবে এটাও সত্য যে মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা আন্দোলনের অধিকারের জন্য লড়াই করে দেশকে সর্বদা কর্তব্যের জন্য প্রস্তুত করার চেষ্টাও করেছিলেন। তিনি নিরন্তর পরিচ্ছন্নতা, বয়স্ক শিক্ষা, নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা, নারী ক্ষমতায়ন, খাদির ব্যবহার এবং স্বদেশি ও স্বনির্ভরতার ধারণা দেশের মানুষের মনে বপন করার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যে কর্তব্যের বীজ বপন করেছিলেন তা স্বাধীনতার পর বটবৃক্ষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, এমন একটি শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, যা কেবলমাত্র জনগণের অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলেছে যতদিন তারা (রাজনৈতিক দল) ছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যদি কর্তব্যের উপর জোর দেওয়া হতো তাহলে ভালো হতো, তাহলে অধিকারগুলো সংরক্ষিত হতো। কর্তব্য দায়িত্ববোধ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের জন্ম দেয়। কর্তব্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা অনুভূতি জাগে যে, এটা আমার দায়িত্ব যা আমাকেই পালন করতে হবে। আর আমি যখন দায়িত্ব পালন করি, তখন কারও অধিকার সুরক্ষিত, সম্মানিত হয়। কর্তব্য ও অধিকার উভয়ের ফলেই গড়ে ওঠে সুস্থ সমাজ।

স্বাধীনতার এই অমৃত মহোৎসবে কর্তব্যের মাধ্যমে অধিকার রক্ষার পথে চলা আমাদের জন্য খুবই প্রয়োজন। এটি কর্তব্যের পথ যেখানে অধিকার নিশ্চিত করা হয়। এটি কর্তব্যের পথ যা সম্মানের সঙ্গে অন্যের অধিকারের গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রদান করে। আর যখন আমরা সংবিধান দিবস উদযাপন করি, তখন আমাদের সর্বদা এই চেতনা থাকা উচিত যে আমরা আরও বেশি মাত্রায় নিষ্ঠা ও দৃঢ়তার সঙ্গে কর্তব্যের পথে চলতে থাকলে সকলের অধিকার সুরক্ষিত হবে। আজ আমরা সৌভাগ্যবান যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি, তাঁরা যে ভারত গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই ভারত নির্মাণ করতে পেরেছি। সেই স্বপ্ন পূরণে আমাদের পথে কোনো বাধা থাকতে পারে না। □

কাশ্মীরের ভারতভুক্তির প্রস্তাব দুবার প্রত্যাখ্যান করেছেন নেহরু

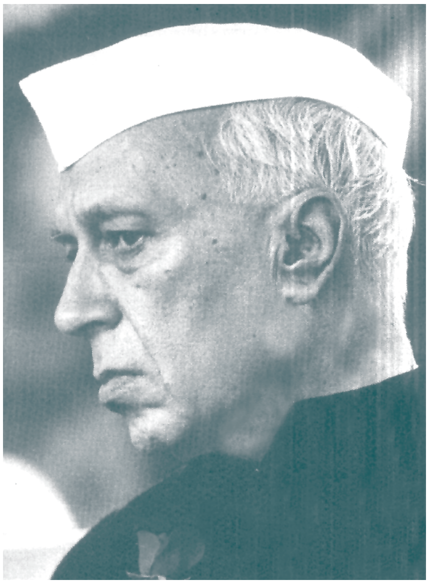

দিগন্ত চক্রবর্তী

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হলেও, যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার স্বপ্ন বুকে নিয়ে বিপ্লবীরা বুকের রক্ত দিয়েছিলেন, সেই ভারতবর্ষকে আমরা পাইনি। খণ্ড খণ্ড হয়ে গিয়েছেন আমাদের দেশমাতা। 'কাশ্মীর হতে কন্যাকুমারী, গান্ধার হতে ব্রহ্মদেশ'—গানে যে অখণ্ড ভারতের কথা বলা হয়েছে বাস্তবে তা হয়নি। ভারতের উত্তরে অবস্থিত ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অর্ধেক চলে গিয়েছে পাকিস্তানের কবলে। এবার সেই পাক অধিকৃত কাশ্মীর ফেরানো নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণায় ভারতীয় সেনার এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ পেলেই পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর পুনর্দখল করতে প্রস্তুত ভারতীয় সেনা।

দেশভাগের সময় যে অংশটি পাকিস্তানের দখলে চলে যায় তার সামরিক গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ। হিমালয় ও কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীতে বিস্তৃত এবং আফগানিস্তান, চীন, ভারত ও পাকিস্তান বেষ্টিত গিলগিট-বাল্টিস্তান কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অঞ্চলটি যা পাকিস্তান অধিকৃত এবং যার উপর ভারত দাবি জানিয়ে চলেছে, তা কাশ্মীরের উত্তরতম প্রান্তে অবস্থিত এবং লাদাখের কিছু অংশ এর মধ্যে পড়ে। এই অঞ্চলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ইস্যুর জন্য এলাকাটির তাৎপর্য ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ১৯৪৭ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের কিছু অংশ পাকিস্তান অবৈধভাবে দখল করে নেয়। ভারত এই অংশটিকে 'পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর'(পিওকে) বলে উল্লেখ করে। অঞ্চলটি জাতিগত ও ভাষাগতভাবে দুটি ভিন্ন এলাকা নিয়ে গঠিত। পাকিস্তান এই অংশের নাম দিয়েছে 'আজাদ জম্মু ও কাশ্মীর' বা 'এজেকে'। যার মধ্যে আছে কাশ্মীর ও জম্মুর কিছু অংশ এবং গিলগিট-বাল্টিস্তান।

গিলগিট-বাল্টিস্তান পিওকে'র মোট এলাকার ৮৬ শতাংশ। স্বাধীনতার পর থেকে ভারত সর্বদা কাশ্মীরের সেই অংশগুলি পুনরুদ্ধারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। গিলগিট-বাল্টিস্তান এখনও সরকারিভাবে ভারতীয় মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃত পরিস্থিতি নির্বিশেষে এলাকাটি ঐতিহাসিকভাবে ও আইনগতভাবে ভারতীয় ইউনিয়নেরই অংশ। পাকিস্তান নিজেই এই সত্য অস্বীকার করেনি এবং গিলগিট বাল্টিস্তানকে তাদের অংশ করেনি। শুধু এই অঞ্চলটিকে জম্মু ও কাশ্মীরের বৃহত্তর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, যা সে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।

ইতিহাস সাক্ষী, ১৯৪৭ সালের আগস্টে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীনতা পাবার আগে থেকেই কাশ্মীর নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্ট' নামে ভারত

বিভক্তির যে পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল, কাশ্মীর তার ইচ্ছে অনুযায়ী ভারত অথবা পাকিস্তান—যে কোনও দেশেই যোগ দিতে পারবে। কাশ্মীরের তৎকালীন মহারাজা হরি সিংহ চাইছিলেন স্বাধীন থাকতে। পরে তিনি ভারতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। অন্যদিকে পশ্চিম জম্মু এবং গিলগিট-বাল্টিস্তানের মুসলমানরা চাইছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে। ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানের পাখতুন উপজাতীয় বাহিনীগুলির আক্রমণের মুখে হরি সিংহ ভারতে যোগ দেবার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন এবং ভারতের সামরিক সহায়তা পান। পরিণামে ১৯৪৭ সালেই শুরু হয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ যা চলেছিল প্রায় দু'বছর ধরে।

স্বাধীনতার পর থেকেই কাশ্মীর নিয়ে ভারতের যে সমস্যা তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়ী তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে ভুল ইতিহাস পড়ানোর কারণে এই সত্য অজানাই থেকে গেছে। জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতভুক্ত করার জন্য প্রথম থেকেই উৎসাহী ছিল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। জম্মু-কাশ্মীরে স্বয়ংসেবকরা কাশ্মীর নিয়ে নেহরু সরকারের উদাসীনতার বিরুদ্ধে নানাভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন। সেই বহু ঘটনার মধ্যে মাত্র দুটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে জম্মু-কাশ্মীর ভারতভুক্তির জন্য সচেষ্ট হয়। সঙ্ঘের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল মহারাজার কাছে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাকের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেওয়া। কাক ছিলেন হিন্দু কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন ব্রিটিশ। পাকিস্তান কাককে লোভ দেখিয়ে তার মাধ্যমেই জম্মু-কাশ্মীরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভেবেছিল। সন্দেহ নেই এটা ইংরেজ মস্তিষ্কপ্রসূত। কাক বারবার ভারত সরকারের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরের ভারতভুক্তির আলোচনা পিছিয়ে দিচ্ছিলেন। উদ্দেশ্য পাকিস্তানের হাতে আরও সময় দেওয়া। সঙ্ঘ কাকের বিরুদ্ধে নানা জায়গায় প্রতিবাদসভা করে মহারাজের কাছে কাকের কাজের বিবরণ দিয়ে দাবিপত্র পেশ করে। পদচ্যুত হন কাক। জম্মু-কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য গণস্বাক্ষর করে তা মহারাজা হরি সিংহের কাছে পাঠায়। এ বিষয়ে জম্মুর পণ্ডিত প্রেমনাথ ডোগরা (সঙ্ঘ কার্যকর্তা) বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। মহারাজের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক থাকায় সেপ্টেম্বর(১৯৪৭) মাসে তিনি শ্রীনগরে এসে মহারাজাকে ভারতে যোগ দেওয়ার কথা জোর দিয়ে বলেন। অপর দিকে মহারাজার এক দেওয়ান উত্তপ্রদেশের এক সঙ্ঘ কার্যকর্তার পরিচয় হওয়ায় তার মাধ্যমেও মহারাজা সিংহের সঙ্গে বার্তালাপ হয়। এই সবই ছিল তৎকালীন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর নির্দেশ অনুসারে। সঙ্ঘ তথা সকল দেশপ্রেমী ভারতীয় চেষ্টা করেছিলেন জম্মু-কাশ্মীর যাতে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকে।

এই সমস্ত উদ্যোগের মাধ্যমে পাকিস্তানের উদ্দেশ্য এবং জম্মু-কাশ্মীর আক্রমণের প্রস্তুতির কথা মহারাজকে বিশেষভবে বলা হয়। মহারাজের যে ভারতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না তা নয়। কিন্তু ভারতে যোগ দিলে তার রাজ্যের পরিস্থিতি খুব খারাপ হবে এমনই জানিয়েছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাক এবং ভারতের গভর্নর জেনারেল মাউন্টব্যাটেন। দ্বিতীয়ত, তিনি তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। মহারাজা শেখ আবদুল্লাকে পছন্দ করতেন না অথচ নেহরু শর্তই দিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের ভারতভুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই আবদুল্লাকে ক্ষমতায় আনতে হবে। নেহরু শেখ আবদুল্লাকে সমর্থন করায় মহারাজা তাকে কাশ্মীরে ঢুকতে দেননি।

ঘটনাটি হলো ১৯৪৬ সালের ১০ মে শেখ আবদুল্লার ন্যাশনাল কনফারেন্স ১৯২২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দেলনের ঢঙে 'কুইট কাশ্মীর' বলে মহারাজার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। অর্থাৎ ভারত ভাগের সিদ্ধান্তের একবছর আগেই কাশ্মীরকে ভারত ছাড়ার কথা বলা হয়েছিল। ভারতের কোনও দেশীয় রাজ্যে তো এরকম কথা ভাবাই যেত না। তাহলে কি ১৯৪৬-এর ডাইরেক্ট অ্যাকশনের সময় কাশ্মীরেও কোনও ডাইরেক্ট অ্যাকশন আরম্ভ করার পরিকল্পনা করেছিল লিগ ও ব্রিটিশরা? আর নেহরুই-বা কেন কাশ্মীরে গিয়ে শেখ আবদুল্লাকে মদত দিতে চেয়েছিলেন! সে বিষয়ে বিতর্ক থেকেই যাচ্ছে।

সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যকর্তা এবং জাতীয়তাবাদী নেতারা কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের উদ্যোগে হরনাম সিংহকে দিয়ে মহারাজা হরি সিংহ নেহরুর কাছে ভারতভুক্তির প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু নেহরু তা প্রত্যাখ্যান করেন। মহারাজা আবার ১৯৪৭ সালের ১৩ অক্টোবর গুরুনাম সিংহকে দিয়ে ভারতভুক্তির প্রস্তাব পাঠালে নেহরু আবারও তা প্রত্যাখ্যান করেন। এখানেই প্রশ্ন, তিনি কাশ্মীরকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত না করে কী করতে চাইছিলেন?

১৮ অক্টোবর ১৯৪৭ শ্রীগুরুজী স্বয়ং কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বেলা সাড়ে ১০টায় শুরু হওয়া তাদের আলোচনায় সঙ্ঘের আর কোনও কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন না। কী কথা হয়েছিল তাও জানা যায়নি। তবে দু'পক্ষই যে আশাবাদী ছিলেন তা বোঝা যায়। শ্রীগুরুজীর এই সফরে মহারাজের সঙ্গে আলোচনায় অন্যান্য ঘটনাক্রম গুরুতর হয়ে উঠেছিল। এসবের কারণে মহারাজা ২০ অক্টোবর ১৯৪৭ ভারতের অন্তর্ভুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেন।

কাশ্মীর যে ভারতেরই ছিল এবং চক্রান্তের ফলেই তার অনেকটা অংশই আজ পাকিস্তানে তা বোঝাই যাচ্ছে। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর এই বিষয়ে গুরুত্বহীনতার অভিশাপ ৭৫ বছর ধরে এই সমস্যাকে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান ভারত যথেষ্ট আত্মনির্ভর ও শক্তিশালী হয়েছে। তাই ভারতের পাকঅধিকৃত অংশ পুনরায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে বর্তমান কেন্দ্র সরকার ভাবতে পারছে। আর অখণ্ড ভারতের যে স্বপ্ন তখনই বাস্তবায়িত হবে যখন ধীরে ধীরে এগুলির বাস্তবায়ন ঘটবে। পাক অধিকৃত কাশ্মীর আবারও ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে এই আশা করাই যায়। □

সেদিনের তপন থিয়েটারের আড্ডা

কৃষ্ণচন্দ্র দে

তপন থিয়েটারের তাপস জ্ঞানেশ মঞ্চে ১৪ নভেম্বর জমজমাট আড্ডা বসেছিল। বিষয় ছিল ‘ থিয়েটারে বর্তমান সামাজিক সমস্যার অন্বেষণ’। এই আড্ডা যেন আমার মনে এক দখিনা বাতাস বয়ে আনলো। এমন সুন্দর আশাব্যঞ্জক আলোচনা সচরাচর দেখা ও শোনা যায় না। উপস্থিত ছিলেন রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, অভীক ভট্টাচার্য, সত্যপ্রিয় সরকার, প্রেমরঞ্জন দাশগুপ্ত ও আরও কয়েকজন। সঞ্চালনায় ছিলেন সুশান্ত মজুমদার। প্রথম বক্তা অভীক ভট্টাচার্য বললেন থিয়েটারে মস্তিষ্ক চর্চার ইতিহাস ক্রমাগত হ্রাস পেতে চলেছে। এরপরে তৈরি হবে নতুন নতুন শূন্যতা, আরও শূন্যতা। মানুষের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার যদি হৃদয়ে অনুরণন না ঘটায় তাহলে সমস্ত কিছু ফাঁকা হয়ে যায়। প্রসেসটা যখন ঘনতর হয়, প্রোডাকশনটা তখনই একটা কিছু হয়ে যায়। দর্শক রিলেট করতে পারে। হৃদয়ে জ্বালা যন্ত্রণা না থাকলে নাট্যচর্চা বা সামাজিক সমস্যার অন্বেষণ করা যায় না। নাটকের মধ্যে দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটাতে হয়। নাটকে গতিশীলতা আনতে একটা দ্বন্দ্ব থাকতেই হবে। কোনো শিল্পচর্চা দ্বন্দ্ব ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না। নাটকের সহযোগী উপাদান যদি যুক্তও হয় কিন্তু যদি সামাজিক কোনো সম্পর্ক সৃষ্টি না হয়, বৃহত্তর সমাজে তার কোনো ঢেউ তৈরি হবে না। তাতে তেমন কোনো আন্দোলনই সৃষ্টি হবে না। অভিঘাতটা প্রয়োজন। দর্শককে একটু ধাক্কা দিতে হবেই। আমরা বর্তমানে প্রযুক্তির ঘেরাটোপে বন্দি হয়ে গেছি। আমরা যদি প্রযুক্তিকে সুস্থ বোধ দিয়ে দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে পারি তবেই একটা নিনাদ তৈরি হতে পারে। একটা নতুন কাজ বা সৃষ্টি হতে পারে। একটা সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। রামকিঙ্করের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, শিল্পী যখন পোর্ট্রেট করেন বা কোনো কিছু আঁকেন সেটা সব সময়েই সেলফ্ পোর্ট্রেট মনে রাখতে হবে। দর্শক নিজের অবস্থানকে পরখ করতে চান।

প্রেমাঞ্জন বলেন, ‘আমি বিষয়টাকে অন্যভাবে দেখি। অনুদানভিত্তিক থিয়েটার কি আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে? যদি না হয় তবে কোনো ক্ষতি নেই। যদি সত্যি হয় তবে তা চিন্তার

বিষয় বই কী। থিয়েটার মুখোমুখি কথা বলা শেখায়। কোন ক্রাইসিসটা সম্প্রতি আসছে সেটা নাট্যব্যক্তিরা বুঝতে পারে। কারণ থিয়েটারের লোকেরা নিজেদের সেসপিয়াল বলে দাবি করতে ভালোবাসেন। ইবসেন, হ্যারল্ড প্রিন্টার, স্যামুয়েল বেকেট কিংবা জর্জ বার্নার্ড শ’ রিয়ালিস্টিক ড্রামা তৈরি করলেন রোমান্টিসিজমকে একেবারে ছুড়ে ফেলে দিয়ে। থিয়েটারই পঞ্চম বেদ। তৈরি করেছিলেন নাট্যাচার্য ভরতমুনি। করলেন সমস্ত বেদকে অ্যামালগামেট করে। অনুদানভিত্তিক থিয়েটার আমাদের লড়াই করার মানসিকতায় ঘাটতি এনে দিচ্ছে না তো? আমরা লড়াই করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি না তো? দীনবন্ধু মিত্র, উৎপল দত্ত কি নীলদর্পণ, কল্লোল লিখে ভুল করেছিলেন? আমার কাজ রাজনীতির ভুল বা অপপ্রয়োগকে তুলে ধরা। কেন আমরা ভয় পাচ্ছি? শুধু কালো তালিকাভুক্ত হবার ভয়ে? প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের আগুনকে আমাদের জ্বালাতেই হবে। এটাই থিয়েটারের কাজ। এই দায় এড়াতে পারে না। থিয়েটার সোচ্চার হোক। জীবন থেকে পালিয়ে কোনোকালেই বাঁচা যায়নি।

রঞ্জনদা বললেন, আমি বরাবর প্রফেশনালিজমকে গুরুত্ব দিয়েছি। একটা ঐক্যতান বেজে উঠেছিল সমস্ত উৎসবকে ঘিরে। শাসক কীভাবে আমাদের দেখছে সেটা ভাবতে হবে। পরখ করে নিতে হবে। থিয়েটার, নাটকের মধ্য দিয়ে মানুষ মহাজীবনকে চিনেছে। প্রমিথিউস স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে এনেছিল মানব সভ্যতার উন্নতির জন্য। দেবতা জিউস পাথরে শিকল দিয়ে বন্দি করে রেখেছিল। সমুদ্রমন্থনে ব্রহ্মা বললেন ভরতমুনি তোমাদের যে জিনিস দিয়েছে তা তোমরা ভেঙে দিও না। কোনো নাটক সকলকে খুশি করতে পারে না। সেফোক্লিসের আন্তিগোনে বা রাজসভাকবি হিসেবে কালিদাস রাজভাতা নিয়েছেন কিন্তু রাজতন্ত্রকে কোনোদিন ক্ষমা করেননি। গ্রান্ট নিলেও সরকারি পলিসির ব্যর্থতা বা তার সমালোচনা করতে কোনো ভয় থাকা উচিত নয়। ফ্যাসিবাদী নাটক আমরা করিনি, এটা আমাদের দুর্বলতা। করা উচিত ছিল। নাট্যকর্মীরা সামাজিক, প্রশাসনিক অন্যায়ে প্রতিবাদ করেননি। এটা আমাকে কষ্ট দিয়েছে।

সত্যপ্রিয় সরকার বললেন, থিয়েটার বর্তমানে সামাজিক সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। ইদানীং একটা সমস্যা হলো কেউ ভালো নাটক করলে আমার বা অন্য কারও অসুবিধা হচ্ছে। কজন দর্শক এল সেটা বড়ো কথা নয়, কজন সেটা বুঝতে পারল সেটাই বড়ো কথা। আগামী প্রজন্মকে তৈরি করতে হবে। আমরা যা পারিনি, কেন পারিনি তা ওদের বোঝাতে হবে। ওরা যেন সফল হয়।

শেষে আর কয়েকটা কথা বলতেই হয়। অভীক যখন বলছিলেন তখন তা মনের ক্যানভাসে একটা ছবি বা দৃশ্যপট হয়ে ভেসে উঠছিল। বক্তব্যের মধ্যে একটা চিত্রধর্মিতা নির্মাণ করা ওর মজ্জাগত। শুধু শোনাই যায় না, দেখাও যায়। প্রেমাঞ্জন বিস্ময়ে অবাক করে দিয়েছেন। ওর কথায় যেমন তীব্রতা আছে, তেমনই সোজাসাপটা ও অকপট। রঞ্জনদা তো পণ্ডিত মানুষ। একটা জ্ঞানের ভাণ্ডার। তাঁর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের চেহারাটাই পালটে যায়। আর সত্যপ্রিয় সরকার সকলের বড়ো প্রিয়পাত্র। নিরন্তর কর্মব্যস্ততাও কেড়ে নিতে পারেনি তাঁর রসবোধের ফল্গুধারাকে। □

শ্বেত বিপ্লবের জনক
ভার্গিস কুরিয়েন

প্রিয় বন্ধুরা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অমৃতকালের এই সময়ে, যখন আমাদের দেশ আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে উন্নত দেশ গঠনের সংকল্প পূরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন সেইসব মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো একান্ত আবশ্যক, যাঁরা দেশকে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। এমনই এক ব্যক্তিত্ব হলেন ড. ভার্গিস কুরিয়েন। তিনি সেই সময়ে শ্বেত বিপ্লবের কল্পনা করেছিলেন যখন ভারত দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। ভারত সেসময় দুধের চাহিদা মেটাতে অন্যান্য দেশের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আর আজ ভারত বিশ্বে বৃহত্তম দুগ্ধ উৎপাদনকারী দেশ হয়ে উঠেছে। এটি সম্ভব হয়েছে ভার্গিস কুরিয়েনের চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনার কারণে। তিনি প্রথমে গুজরাটের ছোটো জেলা খেদার কৃষকদের গোপালনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলেন এবং আমুলের মতো একটি সমবায় সংস্থার সেরা মডেল বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করেন।

এই সমবায় মডেলের সাফল্যের কারণেই বিশ্বব্যাপী দুধের বাজারে ভারতের অবদান ২১ শতাংশ। শ্বেত বিপ্লবের জন্য ভার্গিস কুরিয়েন ও ত্রিভুবনদাস প্যাটেলের অবদান সর্বাধিক।

ভার্গিস কুরিয়ন ১৯২১ সালের ২৬ নভেম্বর কেরালার কোঝিকোড়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিঙে বি ই ডিগ্রি অর্জন করেন। তারপর সরকারি বৃত্তি পেয়ে স্নাতকোত্তর করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিসিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। বৃত্তির শর্তানুযায়ী দেশে ফিরে তাঁকে তাঁকে কমপক্ষে তিনবছর সরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হবে। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার সময় ডেয়ারি ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়েও তিনি পড়াশোনা করেন। সেই সময়ে স্বাধীনতার ঠিক আগে ১৯৪৬ সালে গুজরাটের খেদাতে দুধ উৎপাদনকারী কৃষকেরা সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পরামর্শে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলেন। পোলসন নামে একটি সংস্থা সেই সময়ে ওই অঞ্চলে কৃষকদের থেকে কম দামে দুধ কিনত। এতে কৃষকেরা লাভবান হতেন না। খেদা ও আনন্দ তখন গুজরাটের কাইরা জেলার অংশ ছিল। সর্দার প্যাটেল কৃষকদের একটি সমবায় সমিতি গঠন করার এবং পাস্তুর প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি কৃষকদের বলেন, অনুমতি না পেলে এক ফোঁটা দুধও বিক্রি করবেন না। শেষ পর্যন্ত সরকার কৃষকদের দাবি মেনে নেয় এবং এভাবেই কাইরা জেলা দুগ্ধ উৎপাদক

সংগঠনের সৃষ্টি হয়। ত্রিভুবনদাস প্যাটেল এর প্রথম সভাপতি নিযুক্ত হন। ব্যবসা শুরু হয় দুটি গ্রাম থেকে এবং গড়ে প্রতিদিন ২৫০ লিটার দুধ উৎপাদন হয়।

ড. ভার্গিস কুরিয়েন সেই সময় তাঁর বৃত্তির শর্তানুযায়ী গুজরাটের আনন্দে অবস্থিত একটি সরকারি ক্রিমেরিতে কাজ করছিলেন। সেখানেই তাঁর ত্রিভুবনদাসের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। অনেক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। গ্রামাঞ্চলে স্বচ্ছন্দবোধ না করায় কুরিয়েন সংস্থার কাছে অনুরোধ করেন তাঁকে কোনো শহরে পোস্টিং দেওয়ার।

১৯৪৯ সালের শেষের দিকে সরকার তাঁর দাবি মেনে নেয়। তিনি খেদা ছাড়ার মনস্থির করেছিলেন। ত্রিভুবনদাস প্যাটেল বিষয়টি জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের নিয়ে কুরিয়েনের কাছে পৌঁছে যান। অনেক আলোচনার পর ড. কুরিয়েন খেদা জেলা সমবায় দুগ্ধ উৎপাদনকারী সংস্থায় যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি তিনি একজন ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগ দেন। ম্যানেজার হিসেবে কুরিয়েনের সামনে তখন বড়ো সমস্যা ছিল দুধ উৎপাদনকারী কৃষকদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা। কৃষকদের ক্রমাগত যোগদানের ফলে দুধের পরিমাণ এত বেড়ে যায় যে তা নষ্ট হতে শুরু করে। সেই সময় শুধু গোরুর দুধ থেকেই গুঁড়ো ও কনডেন্সড মিল্ক পাওয়া যেত। কিন্তু কুরিয়েন মোষের দুধ থেকে মিল্ক পাউডার ও কনডেন্সড মিল্ক তৈরি করে সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

কৃষকদের ঐতিহ্যগত দক্ষতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে কুরিয়েনের আধুনিক শিক্ষা ও কৌশল দুধ উৎপাদনে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। তিনি মাখন, ক্রিম পনির ইত্যাদি নানাবিধ দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরি করতে সক্ষম হলেন। ১৯৫৫ সালে যখন সমবায় ডেয়ারির নাম ঠিক করার সময় আসে তখন ড. কুরিয়েন এর নাম দেন 'আমুল' (আনন্দ মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেড)। ১৯৫৬ সালে এই সংস্থা প্রতিদিন ১ লক্ষ লিটার দুধ প্রক্রিয়াকরণ শুরু করে। গুজরাট থেকে আমুলের পণ্য অন্যান্য রাজ্যে বিক্রি হতে শুরু করে। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে ড. কুরিয়ন খেদাতে গবাদি পশুখাদ্যের জন্য একটি প্ল্যান্ট স্থাপন করেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তার উদ্বোধন করতে এসেছিলেন। খেদার দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের সচ্ছলতা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। সারা দেশে খেদা মডেলের মতো সংস্থা গড়ে তোলার জন্য তিনি কুরিয়েনকে দিল্লিতে আসতে অনুরোধ করেন। এভাবে ১৯৬৫ সালে দুধ উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। এর কাজ ছিল আমুল মডেলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সারা দেশে সমবায় দুধ সমিতি এবং ইউনিয়ন গঠন করা। ড. কুরিয়েন সেই বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৬৯ সালে যখন ভারত সরকার দেশে দুগ্ধ শিল্পের বিকাশের জন্য অপারেশন ফ্লাড কর্মসূচি ঘোষণা করে, তখন সরকারি সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য একটি পাবলিক সেক্টর কোম্পানির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এভাবে ১৯৭০ সালে ভারেতের ডেয়ারি কর্পোরেশন গড়ে ওঠে। অপারেশন ফ্লাড তিন ধাপে বাস্তবায়িত হয়। প্রথম পর্যায়ে ড. কুরিয়েন সারা দেশে প্রায় ১৩টি দুগ্ধজাত পণ্যে তৈরির প্ল্যান্ট তৈরি করেন এবং গবাদি পশুর জন্য একটি খাদ্য কারখানা স্থাপন করেন। ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় পর্যায়টি শুরু হয় যা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চলে। এই সময়কালে কুরিয়েন সারা দেশে প্রায় ১৭০টি দুধের প্ল্যান্ট এবং ৩২টি গবাদি পশুখাদ্য কারখানা স্থাপন করেন। এরপর আসে অপারেশন ফ্লাডের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব। এটি ১৯৯০ সালে শুরু হয়। এর অধীনে সঠিকভাবে কাজ না করা ডেয়ারিগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল। এরজন্য আলাদা তহবিল গঠন করে তাদের উন্নয়নের চেষ্টা করা হয়। মানুষ যাতে সহজে দুধ পায় তারজন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে মিল্ক ভেন্ডিং মেশিন বসানো হয়। ১৯৯৭ সালে অপারেশন ফ্লাড সম্পন্ন হয়। এটি ভারতের ৭০০টিও বেশি শহরে ন্যায্য মূল্যে ভালো মানের দুধ সরবরাহ করতে সহায়তা করে। অন্যদিকে, সেইসঙ্গে পশুপালনও আয়ের একটি প্রাধন উৎস হয়ে ওঠে। এর ফলে ১৯৯৮ সালে ভারত বিশ্বের বৃহত্তম দুধ উৎপাদনকারী দেশ হয়ে ওঠে।

এই বিশেষ কৃতিত্বের জন্য সারা বিশ্ব ড. কুরিয়েনকে 'শ্বেত বিপ্লবের জনক' বলে অভিহিত করেছে। ১৯৫১ সালে ১৭ মিলিয়ন অর্থাৎ ১ কোটি ৭০ লক্ষ টন বার্ষিক দুধ উৎপাদনের মাধ্যমে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০২১ সালে তা ২০৯.৯৬ মিলিয়ন অর্থাৎ ২০ কোটি ৯৯ লক্ষ ৬০ হাজার টনে পৌঁছেছে। ১৯৯৯ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মবিভূষণ সম্মানে ভূষিত করেছে। তাঁকে রামন ম্যাগসেসে এবং বিশ্ব খাদ্য পুরস্কারের মতো সম্মান প্রদান করা হয়। ভারতের শ্বেত বিপ্লবে তাঁর অবদানকে স্মরণ করার জন্য তাঁর জন্মদিন ২৬ নভেম্বর দিনটিকে 'জাতীয় দুগ্ধ দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। ২০১২ সালে ৯০ বছর বয়সে কর্মযোগী ভার্গিস কুরিয়েন শেষনিঃশ্বাস তাগে করেন। *(সংগৃহীত)*

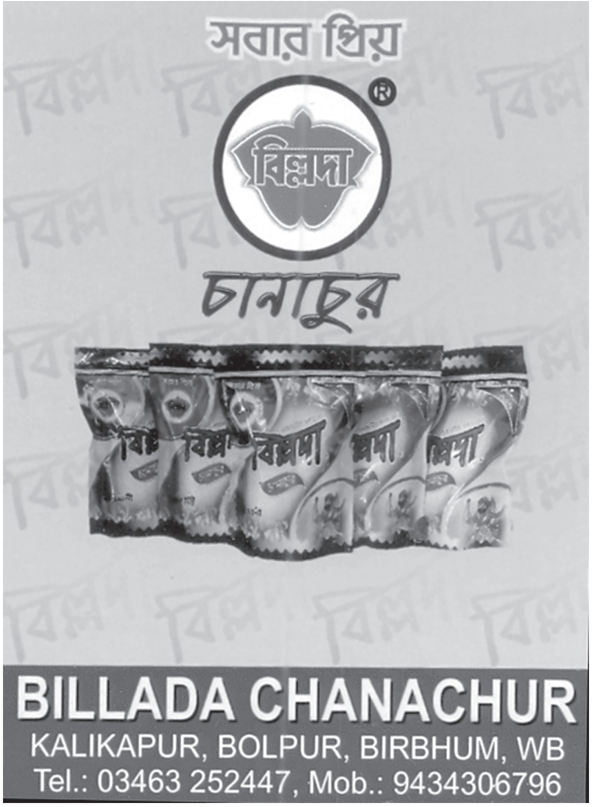

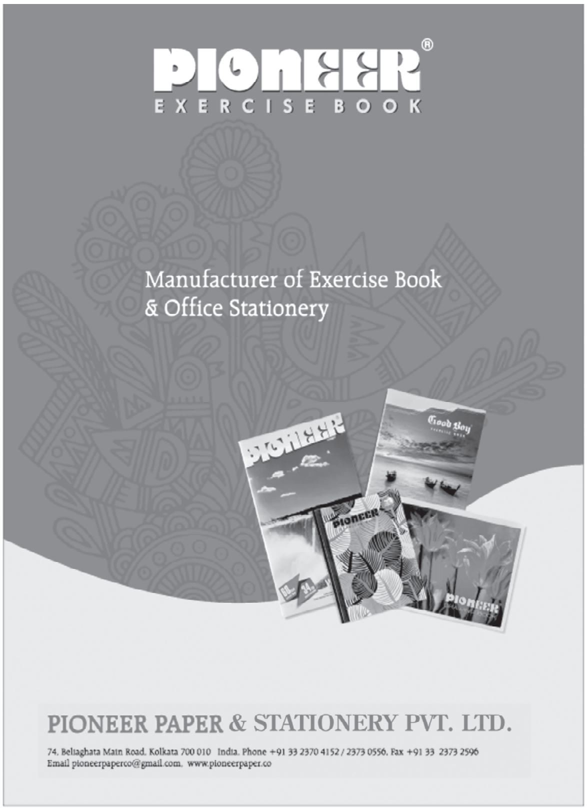

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সর্বগুণান্বিত বিস্ময় উদ্ভিদ গাঁজা

অধ্যাপক নির্মল মাইতি

গাঁজা ভারতীয় কৃষ্টির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত, বিশেষত শিব ও শিবভক্তদের সঙ্গে গাঁজার বিশেষ সম্পর্ক। সমুদ্র মন্থনের সময় হলাহল ও অমৃত কলস পাওয়া যায়। শিব নিজ কণ্ঠে এই হলাহল ধারণ করে নীলকণ্ঠ হলেন। আর এই অমৃতকে বিশোধন করার জন্য নিজের অঙ্গ থেকে একটি বস্তু উৎপন্ন করলেন, তা হলো অঙ্গজ, যার অপভ্রংশ হলো গাঁজা। আরও একটি উপাখ্যান হলো, দেবতারা যখন অমৃতকলস নিয়ে লুকোচুরি করে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলন, তার একফোঁটা পৃথিবীতে পড়ে যায় এবং তাই হলো গাঁজা। অর্থাৎ পৌরাণিক উপাখ্যান অনুযায়ী গাঁজাকেই ঠারেঠোরে অমৃতের বিকল্প বলা হচ্ছে।

গাঁজা, ভাং ছাড়া শিবপূজা সম্পূর্ণ হয় না। শিবরাত্রিতে শিবের মাথায় গাঁজা ভাং চড়াতে হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে গাঁজার সংশ্লিষ্টতা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। আয়ুর্বেদে গাঁজাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিরডির সাঁইবাবা এবং মহারাষ্ট্রের শেগাঁওয়ের বিখ্যাত গজানন স্বামীর পুজোতে গাঁজার ছিলিম প্রসাদ হিসেবে দিতে হয়। 'আমার জীবনকথা' গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দজী গঙ্গোত্রীর পথে যাবার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন , ''ভাটমারীচটি হইতে দুইটি পথ দুইদিকে গিয়াছে। একটি গঙ্গোত্রীর দিকে ও অপরটি যমুনোত্রীর দিকে। আমি ও তুলসী প্রথমে গঙ্গোত্রীর পথে চলিতে লাগিলাম। পথে মাঝে মাঝে চারিদিকে অসংখ্য সিদ্ধিগাছ দেখিলাম। আমরা মুঠা মুঠা শুকনা সিদ্ধিগাছের পাতা লইয়া মাঝেমাঝে খাইতে লাগিলাম—একটু নেশার উদ্রেক হয়'' (১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জীবনপঞ্জির পরিচয় তিনি দেন, তা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয়। প্রথম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১৯৬৪, ২০১৫ সালে ষষ্ঠ সংস্করণের ১৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ৫৪ তম আচার্য শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর পরামারাধ্য গুরুদেব ছিলেন শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী দেবদাসজী। জীবন চরিতে কাঠিয়া বাবাজী লিখছেন, ''আমার গুরুদেব একটি ছোট ঝুপড়ির ভিতরে থাকিতেন, আসনে সর্বদা উপবিষ্ট থাকিতেন। ....সাধারণত তাঁহার কোনো আহার ছিল না, কেবলমাত্র একবার বিভূতি জলে গুলিয়া পান করিয়া তাহা উদ্গার করিয়া ফেলিতেন এবং চরস ও গাঁজার ধূম সময় সময় পান করিতেন'' (মহন্ত মহারাজ সন্তদাস বাবাজী ব্রজবিদেহী প্রণীত ব্রজবিদেহী মহন্ত মহারাজ শ্রীশ্রী ১০৮ স্বামী রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর জীবন চরিত, দ্বাদশ সংস্করণ ২০০৯, কাঠিয়া বাবার আশ্রম, সুখচর, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২১)। তৎসত্বেও গাঁজা সম্পর্কে আমাদের হীনধারণা বর্তমান রয়েছে। আমরা শিবকে দেবাদিদেব মহাদেব বলি। তাহলে মহাদেবের সঙ্গে যা সম্পর্কিত, তা স্বভাবতই ধন্য ও মহিমান্বিত। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গাঁজার গুরুত্ব আলোচিত হওয়া উচিত।

গাঁজা গাছের বিভিন্ন প্রকারের মধ্যে Cannabis Indica এবং Cannabis Sativa প্রধান। গাছের ফুল থেকে গাঁজা, দেহের আঠালো রস থেকে চরস (একে হ্যাসিস বা হ্যাসও বলে), পাতা ও বীজ থেকে হয় ভাং। অ্যালোপ্যাথিতে যেমন ইথানল ভিত্তি, আয়ুর্বেদে তেমনি গাঁজা। অথর্ববেদে (1500 BC নাগাদ) বর্ণনা আছে

Book 11, Hymn 6, Verse 15 of Atharva Veda-Samhita

পঞ্চ রাজ্যানি বীরূধাম্ সোমশ্রেষ্ঠানি ক্রমঃ।

দর্ভো ভংগো যবঃ সহ তে নো মুঞ্চন্ত্ব অংহসঃ।।

"To the five kingdoms of the plants which Soma rules as Lord we speak.

Darbha, hemp, barley, mighty power : may these deliver us from woe.'

পঞ্চগুল্ম রাজ্যে সোম অবশ্যই রাজা; আর দর্ভ (কুশ), ভাং, যব এবং সহ গুল্ম আমাদের দুশ্চিন্তা মুক্ত করুক। সুশ্রুত সংহিতাতে (৮০০ খ্রিঃ পূঃ) গাঁজাকে কফ ও অতিসারের প্রতিবিধান বলা হয়েছে। নরহরি পণ্ডিত (৩০০ খ্রিঃ) সম্পাদিত রাজনির্ঘণ্টতে গাঁজাগাছের বর্ণনা এবং তার ওষধি গুণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। তাতে পেটে বায়ু মুক্তি, স্মৃতিবর্ধক ও ক্ষুধা উদ্রেককারী হিসাবে গাঁজার কথা বলা হয়েছে। ষড়ঙ্গধর সংহিতা, ধুর্তসমাগম (১৫০০ খ্রিঃ) ও ভাবপ্রকাশ (১৬০০ খ্রিঃ) গ্রন্থে গাঁজার উল্লেখ আছে। অজ্ঞান করার জন্য (Anesthesia) গাঁজার ধোঁয়ার ব্যবহার উল্লেখ করা হয়েছে। আয়ুর্বেদের সমস্ত গ্রন্থে গাঁজার ধূম পানকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

Ayurvedic Pharmacopoeia Part–I, Volume–I and National Institute of Drug Abuse-এ ভাংকে ওষধিরূপে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২৭৩৭ খ্রিঃ পূর্বাব্দে ঔষধ বিশেষজ্ঞ চীন সম্রাট শেং-নুড গাঁজার ঔষধীয় ব্যবহারের উপর একটি বই লেখেন।

আয়ুর্বেদে গুণানুসারে গাঁজার ৪০টি নাম দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঃ মোহিনী, রঞ্জিকা, শক্রাশন (ইন্দ্রের আহার), সর্বরোগাঘ্নি, শিবভূতি, সিদ্ধা, সিদ্ধমূলী, সিদ্ধপত্রী, সিদ্ধিদী, সুখনিদান, বিজয়া, অজেয়া, আনন্দ, চপলা, চরস, দিব্যকা, জ্ঞানবর্ধিনী, হর্ষাণী, ইন্দ্রাশন, কালঘ্নি (মৃত্যুঞ্জয়ী) ইত্যাদি। এই নামগুলি থেকেই গাঁজার প্রশংসা সম্পর্কে জানা যায়। এতে গাঁজার তিন ধরনের গুণের ধারণা পাই। (১) মোহিনী আকর্ষণী শক্তি, (২) ধর্মীয় গুরুত্ব ও শিবের সঙ্গে সম্পর্ক এবং (৩) ঔষধীয় গুরুত্ব। সর্বরোগের মহৌষধ অর্থে বিজয়া, সর্বরোগাঘ্নি ও কালঘ্নি প্রণিধানযোগ্য। এর মধ্যে গাঁজার কোনও অপগুণের কথা বলা হয়নি। প্রাচীন ধর্মমত যেমন তাও, বৌদ্ধ, ইসলাম, শামান, বহো সম্প্রদায় প্রভৃতিতে গাঁজার উল্লেখ আছে।

আয়ুর্বেদে গাঁজাকে যক্ষ্মা ও কুষ্ঠরোগের একমাত্র ওষুধ বলা হয়েছে। প্রিয়া মিশ্রর (hempvati. com) গলায় লসিকা গ্রন্থিতে টিবি হয় এবং তিন মাস অসহ্য ব্যথা, যন্ত্রণা ও অনিদ্রায় কষ্ট পান এবং ঘাড় ঘোরাতে পারেননি। অবশেষে গাঁজার ব্যবহার করে তিনমাসে এই যমযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পান। তারপর থেকে তিনি গাঁজার উপর গবেষণা করছেন এবং গাঁজার প্রসারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। প্রসববেদনায় গাঁজার ওষুধ ভক্ষণ এবং চামড়ার উপর গাঁজার তেল মালিশ বিশেষ উপকারী। সোরাইসিসের (PSORAISIS) মতো কঠিন চর্ম রোগে গাঁজার ওষুধ অবশ্য ফলদায়ী। পেটের অসুখ এবং মানসিক রোগে গাঁজা বিশেষ উপশমকারী।

মানুষ ও প্রাণীর স্নায়ুতে গাঁজার উপাদান গ্রাহক (Cannabinoid receptor) থাকে। যা প্রমাণ করে, আমাদের শরীরে গাঁজার স্বাভাবিক উপযোগিতা আছে। তাই বাইরে থেকে গাঁজার উপাদান না পেলে শরীরই তার প্রয়োজনে সেগুলি তৈরি করে নেয়। এগুলিকে Endocannabinoid বলে। গাঁজার মধ্যে ৪০০ প্রকারের যৌগ পাওয়া যায়। তার মধ্যে THC (Delta 9 Tetra Hydro Cannabinol) নেশার উদ্রেক করে। খেলাধুলা করলে বা দৌড়ালে আনন্দ অনুভব হয় অর্থাৎ শরীর নিজের থেকে THC তৈরি করে নেয়। সদ্যোজাতের জন্য হলুদ মাতৃস্তন্যে THC থাকে। THC-কে anadamide বলা হয়। আনন্দময়ী থেকে Anandamide কথাটি এসেছে। ইসরায়েলি বিজ্ঞানী গবেষক Uwe Bleshing আয়ুর্বেদে গাঁজার বর্ণনার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ এই সংস্কৃত নাম দিয়েছেন। তাঁর বইটির নাম The Cannabis Health Index : Combining the Science of Medical Marijuana with Mindfulness Techniques to Heal 100 Chronic Symptoms and Diseases. তিনি তাঁর বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে আয়ুর্বেদে গাঁজার গবেষণা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। বইটি আমাজনে উপলব্ধ।

THC ছাড়া বাকি যৌগগুলিকে একত্রে CBD (Cannabidio) বলা হয়। THC -কে পৃথক করে CBD তেল ব্যাপকভাবে আধুনিক চিকিৎসাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। হৃৎপিণ্ডের রক্তজালিকায় বাধক দূর করে Heart surgery এড়ানো গেছে। ক্যানসার, আলঝাইমার, পার্কিনসন, মৃগীরোগ, অনিদ্রারোগ, মানসিক ও স্নায়বিক রোগে গাঁজার ওষুধ বিশেষ উপকারী। মৃগী রোগে ঝাঁকুনি আসার সঙ্গে সঙ্গে CBD তেল ব্যবহার করলে ৩ সেকেন্ডে ঝাঁকুনি প্রশমিত হয়। এছাড়াও পেটের অসুখ, গা-হাত ব্যথা, অস্থিভঙ্গ প্রভৃতিতে গাঁজা উপকারী। অ্যাসিডে পোড়ার ক্ষেত্রে গাঁজার উপজাত তারপেন (Tarpen) দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। কেমোথেরাপিতে বমিভাব কাটাতে পারে গাঁজা। আমেরিকা কানাডাতে ক্যানসার, AIDS প্রভৃতি মারণ রোগে উপশম চিকিৎসার জন্য গাঁজা প্রয়োগ করা হয়। নিহাল শিখদের মধ্যে সুখনিদান বা সুখা প্রসাদের প্রথা আছে। যুদ্ধের আগে ও পরে সুখা দেওয়া হয় তাদের মানসিক ভারসাম্য ঠিক রাখতে, যাতে হতাশা ভয় দ্বারা তারা আক্রান্ত না হয়। সুখা হলো গাঁজা।

ওষুধ ছাড়া শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে গাঁজা অদ্বিতীয়। গাঁজার কাণ্ডে উৎকৃষ্ট মানের তন্তু ও সেলুলোজ পাওয়া যায়। গাঁজার তন্তু দ্বারা কাগজ, কাপড়, দড়ি, আসবাবপত্র প্রভৃতি তৈরি হয়। গাঁজার তন্তু বাদে ৭৭ শতাংশ সেলুলোজ থাকে, যা থেকে বিকল্প প্লাস্টিক ও জৈব জ্বালানি

তেল উৎপন্ন করা যায়। গাঁজার সঙ্গে চুনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে উৎকৃষ্ট ইট বা বিকল্প কংক্রিট ব্লক তৈরি করা হয়, যা নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়। একে hempcrete বলা হয়। সর্বোপরি, দূষণ রোধে গাঁজা বিশেষ সক্ষম। কাগজ শিল্প প্রচুর দূষণ ঘটায়। তাছাড়া আসবাব, কাগজ তৈরিতে এবং নগরায়নে অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে, যা ভূমিক্ষয়, বায়ুদূষণ ও আবহাওয়ার দুষ্পরিবর্তন করছে। গাঁজাতন্তুর কাগজ সাতবার পুনর্ব্যবহার করা যায়, কিন্তু কাঠ মণ্ডের কাগজ মাত্র চার বার করা যায়। একটি বৃক্ষ পরিণত হতে ২০-২৫ বছর সময় লাগে। সেখানে গাঁজা মাত্র চার মাসেই উৎপন্ন হয়। গাঁজা যেকোনও জমিতে চার মাসে ১০ টন তন্তু উৎপন্ন হয়। পাঁচ একর জমিতে গাছ লাগিয়ে যে তন্তু উৎপাদন হয়, মাত্র এক একর জমিতে গাঁজা লাগিয়ে সেই উৎপাদন সম্ভব হয়। চীনে ২২৯ খ্রিঃ পূর্বাব্দে হান রাজত্বে গাঁজা কাগজ প্রস্তুত করা হয়। গুটেনবার্গ বাইবেল, টমাস পায়েনের পুস্তিকা এবং মার্ক টোয়েনের উপন্যাস গাঁজা কাগজে ছাপা হয়। রাশিয়াতে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে গাঁজাকাগজে ব্যাংক নোট, স্ট্যাম্প কাগজ প্রভৃতি ছাপানো হতো।

গাঁজাতন্তু নির্মিত কাপড় জীবাণুরহিত ও স্বাস্থ্যপ্রদ। রাসায়নিক তন্তু নির্মিত বস্ত্রে চামড়া, স্তন বা যৌনাঙ্গে ক্যান্সার হতে পারে। কানাডা গাঁজাতন্তু নির্মিত অন্তর্বাসের পেটেন্ট করেছে। উত্তরাখণ্ডে লোকেরা গাঁজাতন্তুর বস্ত্র ব্যবহার করে।

আজ পেট্রোলিয়ামজাত ও রাসায়নিক প্লাস্টিক দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই প্লাস্টিক প্রাকৃতিকভাবে ক্ষয় হয় না। ফলে প্লাস্টিক বর্জ্য বিরাট দূষণ সৃষ্টি করছে। প্লাস্টিক মাটি ও জলে মিশছে। তা খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে। আজ পৃথিবীতে ৮৩ শতাংশ জলের মধ্যে প্লাস্টিক অণুর উপস্থিতি রয়েছে এবং লেবানন ও আমেরিকার পরেই জলের প্লাস্টিক দূষণে ভারত বিশ্বে তৃতীয়। গাঁজার সেলুলোজ থেকে উৎকৃষ্ট বায়োপ্লাস্টিক তৈরি হয়। এই বায়োপ্লাস্টিক প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফলে প্লাস্টিক দূষণ প্রতিহত হয়। এই বায়োপ্লাস্টিক দিয়ে BMW, মার্সিডিজ, বুগাটি প্রভৃতি দামি গাড়ি তৈরি হচ্ছে। জার্মান কোম্পানি PORSHE 2019-এ গাঁজা প্লাস্টিকের গাড়ি নির্মাণ করে। ১৯৪০ সালে ফোর্ড কোম্পানি গাঁজাতন্তু দিয়ে গাড়ি নির্মাণ করে।

গাঁজা তন্তুর বস্ত্র

গাঁজা আমাদের জ্বালানি তেলের সমস্যা সমাধান করতে পারে ভারত তার চাহিদার ৮২ শতাংশ তেল আমদানি করে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার বড়ো অংশ এজন্য ব্যয় হয়। ২০১৭ সালে ভারত 189 MT (Million Ton) জ্বালানি তেল আমদানি করে। জীবাশ্ম জ্বালানি প্রচণ্ড দূষন উৎপন্ন করে। এর বিকল্প হলো ইথানলভিত্তিক জৈব জ্বালানি। এক একর জমিতে গাঁজার যে জৈব বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়, তার থেকে ১০০০ গ্যালন জৈব জ্বালানি তেল উৎপন্ন হতে পারে। জ্বালানি তেল উৎপাদন করতে গাঁজাগাছ পোড়ালে যে CO_2 উৎপন্ন হয়, তা জমিতে বর্তমান গাঁজাগাছের দ্বারা শোষিত হয়। ফলে দূষণ হয় না। গাঁজার জ্বালানি তেল অনেক বেশি পিচ্ছিল হয়।

গাঁজার তন্তুর সঙ্গে চুন মিশিয়ে ইট বা ব্লক (Hempcrete) তৈরি হয়, যা দিয়ে নির্মাণ কাজ হয়। এই ইট তাপের অন্তরক ও আদর্শ কুপরিবাহী। ফলে শীত বা গ্রীষ্মে ঘরের উষ্ণতা বজায় থাকে। ২০১৮ সালে আমেরিকা গাঁজাকে মাদক তালিকা থেকে সরিয়ে কৃষি পণ্যের মর্যাদা দেয়। নিউইয়র্কের Pearson Healthy Materials Lab (HML) গাঁজা ও চুন মিশিয়ে স্বল্প খরচে পরিবেশ বান্ধব বাড়ি তৈরির গবেষণা করছে। ইলোরার গুহার দেওয়ালে গাঁজার তেলের আস্তরণ দেওয়া আছে। ফলে নির্মাণ এবং ছবিগুলি সুরক্ষিত আছে। আয়ারল্যান্ডে মার্ক্স ও স্পেন্সার বিশ্বের সুন্দর শোরুম গাঁজার উপজাত দ্রব্য দিয়ে তৈরি হয়েছে। তা বরফ এবং আগুন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

গাঁজা থেকে উৎপাদিত দ্রব্য প্রকৃতিবান্ধব হওয়ায় দূষণের প্রতিকার হয়। বিশ্বের ২০০টি সর্বাধিক দূষিত শহরের মধ্যে ভারতের ১৪টি শহর রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র ২০১৬ সালের তথ্যানুসারে ৬ লক্ষ শিশু বায়ুদূষণে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে মারা গেছে। ওমেগা-৩ এই রোগে রামবান ওষুধ। গাঁজার বীজে উৎকৃষ্ট ওমেগা-৩ থাকে। গাঁজা বীজের তেলে ৮৫ শতাংশ Essential Fatty Acid (AFA) থাকে। এক চা চামচ গাঁজা তেলে দৈনিক প্রয়োজনীয় EFA পাওয়া যায়। অপুষ্টি দূর করতেও গাঁজার জুড়ি নেই। গবাদিপশুকে গাঁজার খড় খাওয়ানোর ফলে দেখা গেছে দুধের বৃদ্ধি হয়েছে। কোলগেট মাজনে

গাঁজার তেল ব্যবহার করা হচ্ছে । আফগানরা অধিক পরিমাণে গাঁজা সেবন করে। ফলে তাদের সুন্দর পেটাই চেহারা রয়েছে। এছাড়াও গাঁজা থেকে নানারকম নির্দোষ প্রসাধনী দ্রব্য, রং ও বার্নিশ পাওয়া যায়।

গাঁজা হলো সর্বগুণান্বিত এক আদর্শ গুল্ম। এর নেশা উদ্রেককারী মানসিক প্রতিক্রিয়ার জন্য এর বিরুদ্ধে আঙুল তোলা হয়। কিন্তু ঘটনা হলো, গাঁজার নেশা অ্যালকোহলের মতো হিংসার জন্ম দেয় না। উল্লেখযোগ্য হলো, গাঁজাকে উত্তপ্ত না করলে স্বাভাবিক অবস্থায় THC বা CBD থাকে না, থাকে THC Acid (THCA) বা CBD Acid (CBDA), ফলে নেশার উদ্রেক করে না, বরং শরীরে শক্তি প্রদান করে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সময় গাঁজা ধূমপানকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিবাদ হিসেবে দেখা হতো এবং হিপ্পিদের থেকে মুক্তি পেতেই গাঁজাকে জোরদারভাবে বলির পাঁঠা করা হয় এবং এর উপর প্রতিবন্ধ লাগানো হয়। এই অজুহাতে তাদের জেলবন্দি করা হয় (উল্লেখ্য, হিপ্পিদের থেকে মুক্তি পেতে শ্রীল প্রভুপাদকে ISKCON প্রসারে পুরো স্বাধীনতা দেওয়া হয়)। তাছাড়াও গাঁজা বিকল্প হওয়ায় ওষুধ কোম্পানি, তেল কোম্পানি, অ্যালকোহল কোম্পানির বিরোধিতা ও প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। গাঁজার নেশা অ্যালকোহল বা রাসায়নিক ড্রাগের নেশার মতো হিংসা ও উচ্ছৃঙ্খলতার উদ্রেক করে না। আমেরিকার যেসব প্রদেশে গাঁজা নিষিদ্ধ নয়, সেখানে ১৫% কম অ্যালকোহল বিক্রি হয়।

ব্রিটিশরা ভারতে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ও অ্যালকোহল চালু করতে গিয়ে দেখল, গাঁজার জন্য এগুলি জনপ্রিয় হচ্ছে না। কারণ অনেক কম পয়সায় সাধারণ মানুষ গাঁজা থেকেই মানসিক আমোদ এবং ঔষধীয় ফল পেয়ে যায়। তখন ব্রিটিশরা ১৮৯০ সালে Hemp Commission বসায়। ১৮৯৪ সালে ৩৫০০ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন পেশ করে। তারা প্রায় ১২০০ ব্যক্তির মতামত নেয়। এদের মধ্যে কুলি, শ্রমিক, ডাক্তার, যোগী, ফকির, ভাগচাষি, পুরোহিত, সেনা, মানসিক রোগকেন্দ্রের পরিচালক প্রমুখ সবার বক্তব্য নেওয়া হয়। কুলি শ্রমিকরা বলে—গাঁজা সেবনে দুতিন দিন তাদের খিদে পায় না। ফলে অর্থ সাশ্রয় হয় এবং শরীরের ব্যথা দূর হয়। মানসিক রুগিদের মধ্যে সমীক্ষায় দেখা গেছে—গাঁজা মানসিক পাগলামি বৃদ্ধি করে না এবং নৈতিক চরিত্রের অবনমন ঘটায় না। নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে শারীরিক কোনও ক্ষতি হয় না।

গাঁজা কমিশন কিন্তু গাঁজার চাষ বন্ধের সুপারিশ করেনি। ‘‘A total prohibition of the cultivation of the hemp plant for narcotics is neither necessary nor expendient in consideration of their ascertained effects, of the prevalence of the habit of using them, of the social and religious feeling of the subject, and of the possiblity of its driving the consumers to have recourse to other stimulants or narcotics which may be more deleterious’. কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রাজীব গান্ধীর সময় ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) 1985 আইনে গাঁজাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

ভার্জিনিয়ার Margaret M Gedde গাঁজা দ্বারা চিকিৎসায় মনোনিবেশ করেন। তিনি মনে করতেন, গাঁজা দ্বারা সর্বরোগের চিকিৎসা সম্ভব। কিন্তু কাজ শুরু করে দেখলেন, ওষুধ কোম্পানিগুলি চিকিৎসা সংক্রান্ত উপকারের পরিবর্তে লাভের অঙ্কের প্রতিই বেশি আগ্রহী। গাঁজা অধিক মাত্রায় নিলেও মৃত্যু হয় না। কারণ Endocannabinoid তন্ত্রের স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে।

বর্তমানে গাঁজার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হচ্ছে। বিশেষ করে ঔষধীয় ব্যবহার সম্পর্কে। তাই চিকিৎসায় ব্যবহার এবং আমোদ সংক্রান্ত ব্যবহারের জন্যও অনেক দেশই গাঁজাকে নিষেধমুক্ত করছে। ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডে এক সময়ে গাঁজা ব্যবহারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো। তারা আজ গাঁজাকে মুক্ত করে দিয়েছে। নিউজিল্যান্ড, জাপান, জার্মানি, রাশিয়া, ইজরায়েল, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ গাঁজাকে আইনসিদ্ধ করেছে। আমেরিকার অনেক রাজ্যে গাঁজা অনুমোদিত। ফলে ওইসব দেশে গাঁজা থেকে প্রচুর রাজস্ব সংগৃহীত হয়। নেপালে গাঁজা মুক্ত এবং সেখানে একটি গাঁজামন্ত্রক রয়েছে।

কিন্তু শিবঠাকুরের আপন দেশেই গাঁজা নিষিদ্ধ। যদিও জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির স্থলে গাঁজা আইনসিদ্ধভাবে পাওয়া যায়। গাঁজার এত গুণ ও উপকারিতা রয়েছে, যা আমাদের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতিকে উন্নত করতে পারে। সর্বোপরি, ভারতের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির সঙ্গে গাঁজা বিশেষভাবে জড়িত রয়েছে। এমতাবস্থায় ভারত সরকারের উচিত, গাঁজার ওপর থেকে প্রতিবন্ধকতা তুলে নেওয়া। গাঁজার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হলে গাঁজা থেকে রাজস্ব আদায় হবে এবং অ্যালকোহলের ব্যবহার কমবে। গাঁজা চাষ ও বহুল ব্যবহারে উন্নয়নের জোয়ার আসবে।

উল্লেখ্য, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে, গাঁজা কেসে আর জেল নয়। মারিজুয়ানা বা গাঁজা কেসে শাস্তিপ্রাপ্ত বা জেলে আটক সবাইকে অপরাধ থেকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং শাস্তিপ্রাপ্তদের চাকরি পাওয়া ইত্যাদি প্রতিবন্ধ তুলে নেওয়া হবে। এতে প্রায় ৬৫ হাজার মানুষের বিড়ম্বনা মুক্তি ঘটবে। পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের পুলিশ যখন বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের গাঁজা-কেসে ফাঁসিয়ে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ জোর করে বন্ধ করে দিতে চায়, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই পদক্ষেপ বিশ্বে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল। বিশ্বে গাঁজার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে এই ঘোষণা বিশেষ ভূমিকা নেবে। □

নব্য ঔপনিবেশিকবাদীরা ভারতকে ‘ইন্ডিয়া’ বানাতে চাইছে

বিজয় আঢ্য

ভারতবর্ষ এবং তার পুত্ররূপ হিন্দুজাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি কমপক্ষে আট হাজার বছরেরও বেশি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বহমান। এই পবিত্র ভারতভূমিতে যে মূল চিন্তাচেতনার ধারাটি আবহমানকাল থেকে বহমান এবং এই ভূমির সংস্কৃতিকে লালন করে চলেছে, সেই সনাতন ধারাই বর্তমানে হিন্দুত্ব হিসেবে পরিচিত। একথা ঠিক, সামগ্রিকভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশে এই দেশে আগত সকল জাতির অবদান রয়েছে। কিছু বিশেষ বহিরাগত সভ্যতার সংস্পর্শেই তা বর্তমান রূপ নিয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ভারতীয় সংস্কৃতি একটি মিশ্র সংস্কৃতির প্রকাশ মাত্র। ভারতবর্ষে হাজার হাজার বছর ধরে প্রাচীন ঋষি নির্মিত এক বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল রয়েছে যার প্রভাবেই সকল বৈদেশিক সভ্যতা এই দেশের মাটিতে এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। গঙ্গা নদীতে বহু জলধারা মিললেও গঙ্গা যেমন তার নিজস্বতাই বজায় রেখেছে, এই নিজস্বতাও তেমন ভারতের জাতীয়ত্ব।

কিন্তু এই সত্য স্বীকার করা কঠিন ছিল নবজাগরণ পরবর্তী ইউরোপীয় শাসক ও বণিকদের কাছে। মধ্যযুগের ঘন অন্ধকার থেকে বেরিয়ে নিজ ককেশীয় ও অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির গর্বে পুলকিত হয়ে তারা বিশ্ব বিজয়ে বেরিয়েছিল। ভারতের সংস্পর্শে এসে তারা যতই এই সংস্কৃতির বিপুলতা ও ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করল, ততই তাদের হীনমন্যতাবোধ বাড়ল। নানা ছলচাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা শেষে যেদিনে তাদের বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হলো, সেদিন থেকে তারা এই দেশের আত্মমর্যাদা ধ্বংস করার জন্য তাদের কুখ্যাত আর্য আক্রমণ তত্ত্ব আমদানি করল। ম্যাক্সমূলার, ওয়েবার, ডারউইন থেকে মেকলে প্রমুখ পশ্চিমি দিকপালরা এই তত্ত্ব প্রচার করলেন। তাদের ভাবনা-চিন্তায় ছিল— ভারতের মতো এত উন্নত সভ্যতা শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের পূর্বপুরুষরা ছাড়া কেউ তৈরি করতে পারে না। অর্থাৎ জাতিবিদ্বেষী চিন্তা। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো এদেরই এজেন্ট হিসেবে বামমার্গী, উদারবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষপন্থীরা ভারতের গৌরবময় অতীতকে বিকৃত করে মিশ্র সংস্কৃতির দেশ হিসেবে ভারতকে তুলে ধরতে চাইছে। লেখক এইসব গোষ্ঠীকে নব্য ঔপনিবেশিকবাদী বা ‘নিউকোল’ (Neo-colonist) বলে চিহ্নিত করেছেন। এদের এই ষড়যন্ত্র এদেশের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা ও প্রগতির পক্ষে অন্তরায় যা লেখকের ‘দৃষ্টিতে সভ্যতার মন্বন্তর।’

আমরা যখন চলি, তখন পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে সামনের পা ফেলি। এখানেই ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা। লেখক সেই সূত্রেই ভারতবর্ষের বিশেষত পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধের ইতিহাস, পারস্য (ইরান) ও ভারতের সম্পর্ক, ইসলামের অভ্যুত্থান এবং আরব ও ইসলামিক দুনিয়া, ভারতে মুসলমান আক্রমণ ও হাজার বছরের শাসনকাল, পরবর্তীকালে (উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে) মুসলমান নেতা, প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের প্রভাব, ব্রিটিশ শাসন ও বিদেশি খ্রিস্টান মিশনারিদের কাজকর্মের

প্রভাব, কমিউনিস্ট ও ইসলামের সখ্য, ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় রাজনীতি ও দেশভাগ ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্বন্ধে নিজের বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বিচার করেছেন। এই প্রসঙ্গে এদেশের ইতিহাস বিকৃতির কয়েকটি প্রচেষ্টার কথা তিনি তুলে ধরেছেন। যেমন—

(১) ভারতের বহু মৌলিক তত্ত্ব বা চিন্তা এবং পরিভাষার সমতুল্য শব্দ যা ইংরেজিতে নেই, সেগুলি গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। যেমন, ধর্ম, দর্শন, আত্মা, যোগ ইত্যাদি। ধর্মকে 'রিলিজিয়ন'-এর সঙ্গে সমার্থক করে দেওয়া হয়েছে। যদিও রিলিজিয়ন যা উপাসনা পদ্ধতি (way of worship) এবং ধর্ম যা জীবনধারা (way of life)। আসলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐহিক ও পারমার্থিক চিন্তা-চেতনার ভিত্তি মূলগতভাবেই পৃথক। একারণেই বোধ হয় স্বামী বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছিলেন যে ইউরোপীয় ধ্যানধারণার দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক হতে বাধ্য। ভারতের মতো এতো উপাসনাপদ্ধতি, ভাষা ও বর্ণের মেলবন্ধন ইউরোপে কখনো ঘটেনি। কাজেই সেখানে যৌথ রাজনৈতিক চেতনা জাতিসত্তার ভিত্তি হিসেবে মানুষে মানুষে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। আসলে পাশ্চাত্যের জাতীয়তার ধারণা রাজনৈতিক। অন্যদিকে ভারতের মানুষের সহস্র ভিন্ন পরিচয়ের মধ্যে একমাত্র তাদের ধর্মই সেই গ্রন্থি যা মানুষকে একসূত্রে বাঁধতে পারে, একটি প্রকৃত জাতি গঠন করতে পারে। বস্তুত ধর্মই ভারতের আত্মা। এখানে ধর্মের অর্থ প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠান নয়, বরং সকল প্রকৃত ভারতবাসীর হৃদয়স্থিত উচ্চ আধ্যাত্মিকতা, মঙ্গল ভাবনা-নৈতিকতা। এদেশের একজন ভিখারিও 'মা ভিক্ষা দাও, ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন'— এই ভাবনায় ভাবিত। ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী পণ্ডিত ও তাদের দেশীয় অনুগামীদের ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় এই মূল সত্য অনুপস্থিত। বরং জাতিবাদ, বর্ণবাদ, বস্তুগত শ্রেষ্ঠত্ব ও বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবিস্তার যা তাদের ভাবধারার মূল উপাদান— এই দৃষ্টিতে তারা ভারতীয় ধর্ম ভাবনাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। যা তাদের ইতিহাস চিন্তার দীতাকেই তুলে ধরে।

(২) 'হিন্দুত্ব'কে হিন্দুইজম অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক, অসহিষ্ণু, বহুত্ব ধারণার বিরোধীবাচক শব্দ রূপে ব্যবহার করা হচ্ছে! যদিও একদল হিন্দু বালক বয়স থেকেই 'সর্বে ভবন্তু সুখিন, সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ' শুনে বড়ো হয়।

(৩) ইতিহাস বিকৃতি। ইতিহাস পাঠ্য বই এমনভাবে লেখা বা পড়ানো হচ্ছে যা থেকে মনে হয় হিন্দুরা একটা পরাজিত, হীন রাষ্ট্র বা জাতি।

(৪) ভগবান বলতে ইংরেজি 'গড' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। হিন্দুদের কাছে ঈশ্বর মানে সর্বব্যাপী পরম সত্তা এবং সর্বজ্ঞ। গড শব্দটি এই তুলনায় খুবই সীমিত। তাই গড, আল্লা এবং ঈশ্বর এক নয় এবং সংজ্ঞা অনুসারে কখনও এক হতেই পারে না।

(৫) যত বেশি সত্য অন্বেষণের চেষ্টা হচ্ছে, ততই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে— লালকেল্লা, কুতুবমিনার, তাজমহল কে নির্মাণ করেছেন? টিপু সুলতান ও তিতুমির কি স্বাধীনতা সংগ্রামী নাকি ধর্মান্ধ ইসলামপন্থী?

(৬) নব্য ঔপনিবেশিকরা আমাদের মাতৃভূমি ভারতকে 'ইন্ডিয়া' নামেই পরিচিত করাতে বেশি আগ্রহী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথমে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত 'The Crash of a Civilization' গ্রন্থটির পর্যালোচনা ইতিমধ্যেই ড. বেদ প্রকাশ নন্দা, ড. শরদিন্দু মুখার্জি, সাংবাদিক উদয় মাহুরকার প্রমুখ বিদ্বজ্জন করেছেন। বইটির বঙ্গানুবাদ পড়ে অনুভব হয়েছে, বাংলা ভাষাতে সংক্ষিপ্তভাবে হলেও পর্যালোচনা হওয়া উচিত।

বিশেষত 'লেফট-লিবারেল' ও 'সেকুলারিস্ট'— লেখকের ভাষায় 'Neo-colonists'-রা (নব্য ঔপনিবেশিকবাদী) যেভাবে ভারতের গৌরবময় অতীত ও আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক শ্রদ্ধাবিন্দুগুলিকে মুছে দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা করে চলেছে, তাদের এই কদর্য কাজকর্মকে মানুষের কাছে তুলে ধরা খুবই প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে বাংলা ভাষায় মননশীল সাহিত্যের চর্চা লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে। লেখকও তাঁর বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতি অধ্যায়ের শেষে যে তথ্যসূত্র উদ্ধৃত করেছেন, যা সংখ্যার নিরিখে সহস্রাধিক (১০০৬), তাতেই প্রমাণিত লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায়। যদিও বিষয়গুলি ইতিমধ্যেই চর্চিত তবুও বলব, দৃষ্টিভঙ্গীটি স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে। প্রবাসী হয়েও স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি বেদনাবোধই দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে দিতে লেখককে প্রেরিত করেছে।

ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির এই সংকট যে মন্বন্তরের শামিল, লেখক এই কথাটিই বোঝাতে চেয়েছেন। সেইদিক থেকে এই গ্রন্থটি ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গ্রন্থটির পৃথুলতার (৪৯৬ পৃষ্ঠা) কথা জেনেও বহুল প্রচার কাম্য বলে মনে করি।

সভ্যতার মন্বন্তর।
লেখক : কাঞ্চন ব্যানার্জি।
The Crash of a Civilization-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। পাণিনি প্রকাশনী, ২৯এ ব্রজনাথ দত্ত লেন, কলকাতা-১২। মূল্য : ৫৫০ টাকা মাত্র।

স্বস্তিকা

(জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক)

২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬, দূরভাষ : (০৩৩) ২২৪১-০৬০৩, ৫৯১৫

E-mail : swastika 5915@gmail.com / vijoy.adya@gmil.cpm

স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান

আশাকরি আপনি শ্রীভগবানের কৃপায় সপরিবারে কুশলে আছেন। আপনারা অবশ্যই অবগত আছেন যে গত জন্মাষ্টমী তিথিতে (১৯.০৮.২২) স্বস্তিকা পত্রিকা ৭৪ বছর অতিক্রম করে ৭৫ বছরে পা রেখেছে। গত ২২ আগস্ট স্বস্তিকার ৭৫ বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি দিয়ে ৭৫-এর পথ চলা শুরু হয়েছে। বিগত ৭৫ বছরে বহু বাধানিষেধ সত্ত্বেও পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের সার্বিক প্রচেষ্টায় স্বস্তিকা চলার পথকে অব্যাহত রেখেছে। কোনও কিছুর কাছে মাথা নত করেনি। ব্যতিক্রম শুধু গত করোনা মহামারীর কারণে কয়েক সপ্তাহ ছাপার অক্ষরে আপনাদের হাতে পৌঁছোতে পারেনি।

স্বস্তিকার চলার পথে এই শুভ ৭৫-তম বর্ষটিকে বিশেষ মর্যাদা দিয়ে উদ্‌যাপনের জন্য একটি স্বাগত সমিতিও গঠন করা হয়েছে। তাঁরাও এক বছরের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ রাখবেন। তারই প্রথম ধাপ হিসেবে আগামী জানুয়ারি ২০২৩-এ ১৮ ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি ৩১ তারিখ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। নিজ নিজ প্রান্তে তারিখ সুনিশ্চিত করে অভিযান করবেন। স্বস্তিকা গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান হাতে নেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে তিন বঙ্গের সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ও বিবিধক্ষেত্রের প্রমুখ কার্যকর্তারা প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করবেন। আমরা চাই সমস্ত খণ্ড/গ্রামস্তর পর্যন্ত কমপক্ষে প্রতি শাখায় দশটি (মিলন ও মণ্ডলী-সহ) স্বস্তিকা পাঠকদের কাছে পৌঁছে যাক। সরাসরি হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করবে স্বস্তিকা দপ্তর। বিশেষত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক আগ্রহী পাঠক আছেন যাঁরা স্বস্তিকা পড়তে আগ্রহী। এমতাবস্থায় বিনীত আবেদন যে সকলে মিলে একযোগে হাতে হাত মিলিয়ে ৭৫ বছরে ৭৫০০০ স্বস্তিকার গ্রাহক সংখ্যা নিশ্চিত করুন।

তিলকরঞ্জন বেরা
সম্পাদক

বিঃ দ্রঃ— প্রতি মাসের পত্রিকার মূল্য অগ্রিম জমা দিয়ে এজেন্সি নিতে পারেন। এক্ষেত্রে সপ্তাহে কমপক্ষে ১০ কপি নিতে হবে।

।। চিত্রকথা ।। মহামানব মহানামব্রত ।। ২২ ।।

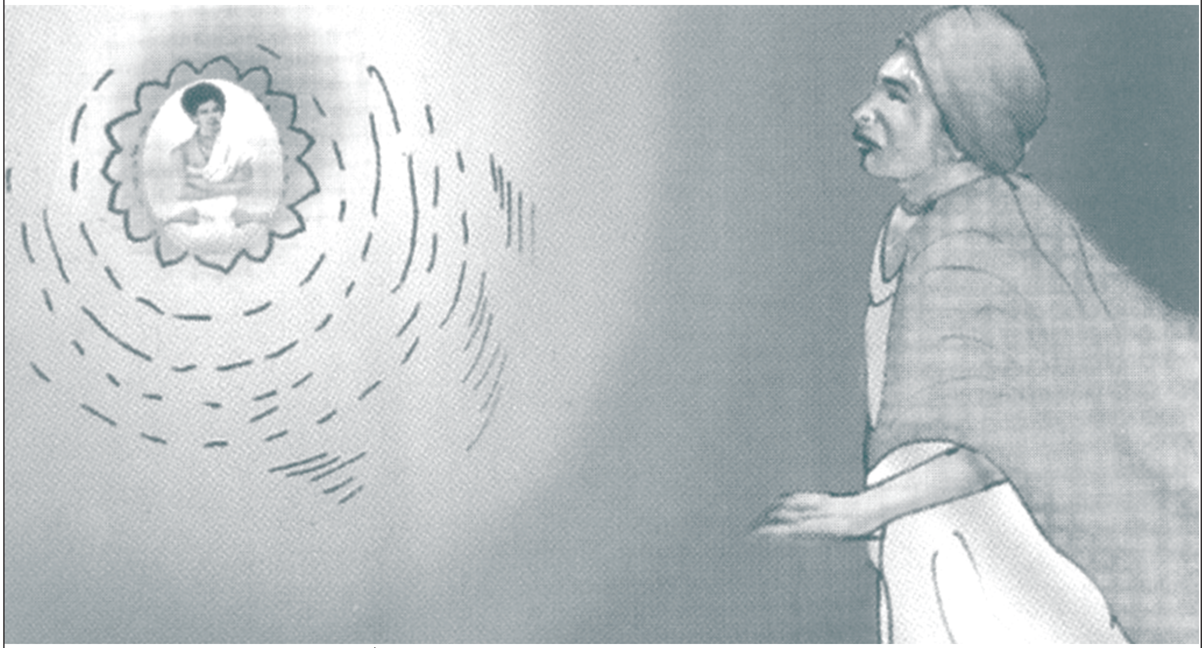

ভুল করে বহু চেনা-অচেনা মানুষের ঠিকানা লেখা খাতাটি বাড়িতেই পড়ে রইল। মহানামব্রতজী যদি কোনো কাজে লাগে ভেবে ঠিকানাগুলি সঙ্গে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর সব উদ্বেগ কেটে গেল যখন তিনি মনের মধ্যে শুনতে পেলেন— একটি ঠিকানা ভরসা করেই যাও। তাঁর আর কোনো দ্বিধা রইল না।

জাহাজের নাম ছিল 'Cente Rosse'। মহানামব্রতজীর কাছে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটার মতো পয়সাও ছিল না। অগত্যা ডেকের যাত্রী হিসাবে তিনি ভেনিসের পথে যাত্রা করলেন।

(ক্রমশ)